# ইবাদত

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

# ইবাদত

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

www.pathagar.com

# ইবাদত

**মুহম্মদ মতিউর রহমান**
প্রকাশিকা ঃ **বেগম খালেদা রহমান**
১০২ সেন্ট্রাল রোড
ধানমন্ডি, ঢাকা

**প্রথম প্রকাশ ঃ** জুলাই, ১৯৯৩
প্রচ্ছদঃ গোলাম মোহাম্মদ

মুদ্রক ঃ

কম্পোজঃ এ্যাডপ্রিন্ট
৪৪৫, বড় মগবাজার
ওয়্যারলেস রেলগেট, ঢাকা।
ফোনঃ৮৩১৬৮৪।

মূল্যঃ বোর্ডবাঁধাই ঃ চল্লিশ টাকা মাত্র
সাদা ঃ পয়ত্রিশ টাকা মাত্র
নিউজ ঃ চব্বিশ টাকা মাত্র

গ্রন্থস্বত্বঃ লেখকের

IBADAT
Muhammad Motiur Rahman
Published by Begum Khaleda Rahman
102, Central Road, Dhanmondi, Dhaka
Published in July, 1993
Price: White paper : Tk 40.00
News paper : Tk 24.00

www.pathagar.com

## উৎসর্গ

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যাঁরা যুগে যুগে প্রাণপণ সংগ্রাম করে গেছেন এবং এখনো যাঁরা সেই সংগ্রামের অত্যুজ্জ্বল, রক্ত-পিচ্ছিল পথে দীপ্ত পদচারণায় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ তাঁদেরইউদ্দেশ্যে-

**মুহম্মদ মতিউর রহমান**

www.pathagar.com

## লেখকের অন্যান্য বই

### সাহিত্য–বিষয়ক

১· বাংলা সাহিত্যের ধারা

২· ফররুখ–প্রতিভা

৩· বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন

৪· ভাষা ও সাহিত্য

৫· সাহিত্যের কথা

### ইসলাম–বিষয়ক

৬· মহানবী (স)

৭· ইবাদতের মূলভিত্তি ও তার তাৎপর্য

৮· সমাজ–সংস্কৃতি–মানবতা

৯· আযান সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য প্রসঙ্গে

### ছোটদের গল্প

১০· মহৎ যাদের জীবন কথা

### অনুবাদ

১১· আমার সাক্ষ্য

১২· ইরান

১৩· ইরাক

### সম্পাদনা

১৪· প্রবাসী কবিকণ্ঠ

www.pathagar.com

# ভূমিকা

১৯৯০ সালের জুলাই মাসে "ইবাদতের মূল ভিত্তি ও তার তাৎপর্য" শীর্ষক আমার লেখা বত্রিশ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটি ছিল মূলতঃ আমার একটি বক্তৃতা। বক্তৃতাটিই পরে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে ছাপা হবার কিছু দিনের মধ্যেই পুস্তিকাটির সমস্ত কপি নিঃশেষিত হয়। অনেকেই ওটা পুনর্মুদ্রণের জন্য তাগাদা দিতে থাকেন। কিন্তু ইতোমধ্যে কয়েকটি বড় বই প্রস্তুতির কাজ হাতে থাকায় ওটা পুনর্মুদ্রণের সুযোগ পাইনি। আমার পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক এ বছরের রমযান মাসে ওটার দ্বিতীয় সংস্করণ তৈরীর কাজ হাতে নেই। আল্লাহতায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে প্রায় তিন মাসে পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়। তবে নতুন ভাবে এটা যা দাঁড়িয়েছে পূর্ব পুস্তিকার সাথে এর তেমন কোন মিল নেই। এর কলেবর যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, বিষয় ও উপজীব্যগত দিক থেকেও এটা অনেক বিস্তৃত হয়েছে। এসব দিক বিবেচনা করে বইটির নতুন নামকরণ করা হলঃ **"ইবাদত"**।

আশা করি, এ বিষয় সম্পর্কে জানতে আগ্রহী পাঠক-পাঠিকা এ বইটি পড়ে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। 'ইবাদত' সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভে বইটি যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে মনে করি।

জ্ঞানের প্রকৃত উৎস মহাগ্রন্থ আল্-কোরআন। এ মহাগ্রন্থের সঠিক ব্যাখ্যাকারী হলেন মানবতার মুক্তি-দিশারী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। আল্-কোরআন এবং পবিত্র হাদীসের আলোকেই ইবাদত সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। মানবিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে এতে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলে সে জন্য রহমানুর রাহিম আল্লাহতায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার কাছেও অনুরোধ, তাঁরা যেন সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করে আমার ভুল-ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ করে দেন।

এ বই-এর পাণ্ডুলিপি হস্ত-লিখনে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন দুবাইস্থ বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুলের শিক্ষক অনুজ প্রতীম মওলানা নূর মোহাম্মদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে এজন্য অসীম বরকত ও জাজায়েখায়ের দান করুন। বইটি মুদ্রণে বিশেষ সহায়তা দান করেছেন বিশিষ্ট দ্বীনী ভাই জনাব ছায়াদুল হক। আল্লাহ তাঁকেও জাজায়েখায়ের দান করুন।

সবশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে জানাই অশেষ শুকরিয়া। তাঁর একান্ত মেহেরবানীতে তাঁর এ নগণ্য বান্দার দ্বারা এ বইটির রচনা ও প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দ্বীনের খেদমত এবং আখিরাতে এ অধমের নাজাতের যরিয়াহ্ হিসাবে এ বইটি কবুল করার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে আকুল মিনতি জানাই। আল্লাহ আমাদের সকল চিন্তা, আমল-আখলাক ও প্রচেষ্টাকে একমাত্র তাঁরই দ্বীন-নির্ধারিত পথে পরিচালিত করুন।আমীন!

**—মুহম্মদ মতিউর রহমান**

**দুবাই ॥ ১৫ জুন ১৯৯৩**

www.pathagar.com

## সূচীঃ

ভূমিকা ..... ৫

প্রথম অধ্যায়

ইবাদতের তাৎপর্য .....৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদতের আসল অর্থ .....১৪

তৃতীয় অধ্যায়

আল্-কোরআনের আলোকে ইবাদত

চতুর্থ অধ্যায়

খেলাফতের দায়িত্ব .....

পঞ্চম অধ্যায়

ইবাদতের মূলভিত্তি .....

কলেমা .....

নামায .....

রোযা ..... ৬১

হজ্জ ..... ৭৩

যাকাত..... ৮১

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার .....৮৭

www.pathagar.com

# প্রথম অধ্যায়

## ইবাদতের তাৎপর্য

আরবী 'আব্‌দ' শব্দ থেকে 'ইবাদাহ্' বা ইবাদত শব্দের উৎপত্তি। 'আব্‌দ্' অর্থ দাস বা একান্ত আত্মসমর্পণকারী। স্রষ্টার প্রতি একান্ত আত্মসমর্পণ ও সেই মহান প্রভুর আদেশ-নিষেধ ও নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালনাই হলো ইবাদত। দাসত্ব বা আত্মসমর্পণের অর্থ হলো যাঁর দাসত্ব স্বীকার করা হয় বা যাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা হয় তাঁর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিই প্রধান বিষয়। এখানে দাস বা আত্মসমর্পণকারীর নিজস্ব কোন ইচ্ছা বা মর্জি থাকতে পারে না অথবা দাসত্ব বা আত্মসমর্পণ কোন এক প্রভুর প্রতি আংশিক এবং অন্য কারো প্রতি আংশিক হলেও চলতে পারে না। দাসত্ব বা আত্মসমর্পণ একান্ত বা সামগ্রিক না হলে সেটা অর্থহীন হয়ে পড়ে। বিশেষতঃ মানব ও অন্যান্য সকল মখলুকাতের স্রষ্টা, বিশ্ব-জগতের একমাত্র নিয়ন্তা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহতায়ালার দাসত্ব করার প্রশ্ন যেখানে সেখানে তো কোনক্রমেই সেটা আংশিক বা অসম্পূর্ণ হতে পারে না। যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদের জীবন-মৃত্যু-আখিরাত যার করতলগত তাঁর প্রতি আমাদের আত্মসমর্পণ সামগ্রিক না হবার যুক্তিগ্রাহ্য কোন কারণই থাকতে পারে না। পৃথিবীতে এমন অন্য আর কোন শক্তির কথা কি কল্পনা করা যায় যে আমাদের জীবন, মৃত্যু ও আখিরাতের ব্যাপারে এতটুকু নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব রাখে? যদি তা না থাকে তাহলে আমাদের দাসত্ব বা আনুগত্যের দাবিদারও আর কেউ থাকতে পারে না। একমাত্র আমাদের স্রষ্টা, পালনকর্তা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী রাব্বুল আ'লামীন আল্লাহতায়ালার দাসত্ব ও একান্ত আনুগত্যের মধ্যেই স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির দায়িত্ব পালন সম্ভব।

অতএব, সুস্পষ্ট হলো-ইবাদত বা দাসত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর-এক্ষেত্রে আর কাউকে শরীক করা যেতে পারে না।-শরীক হবার মত কেউ থাকতেও পারে না।

ইসলামে 'ইবাদত' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। ইবাদত প্রধানতঃ দুই প্রকার। শারীরিক ও আধ্যাত্মিক। আমাদের শরীর অর্থাৎ হাত-পা, নাক-কান, চোখ-মুখ, পা ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে যেসব ইবাদত করা হয় তাই শারীরিক ইবাদত। এছাড়া, আমাদের মন-মগজ, অন্তর ও চিন্তাধারা দিয়ে যেসব ইবাদত করা হয় তা আধ্যাত্মিক ইবাদত হিসাবে গণ্য। আরো এক প্রকারের ইবাদত আছে যেটাকে মা'লী ইবাদত বলা যায়, দান-খয়রাতের দ্বারা যেটা আমরা সম্পন্ন করে থাকি। মূলতঃ এ ধরনের ইবাদতও শরীর এবং মনের সাথে অনেকাংশে যুক্ত। আমাদের মনে যখন ঔদাস্যের সৃষ্টি হয় তখন সম্পদের প্রতি স্বভাবতই আসক্তি কিছুটা শিথিল হয়ে আসে। ফলে হাত দিয়ে তা অপেক্ষাকৃত কম



www.pathagar.com

সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করে দিতে প্রবৃত্ত হই। তাই এ ধরনের ইবাদতও প্রধানতঃ মনের সঙ্গে যুক্ত।

একমাত্র আল্লাহর কথা স্মরণ করে, তাঁর নির্দেশ পালনার্থে যদি আমরা সব ধরনের মিথ্যা কথা বলা, অশ্রাব্য-অশ্লীল বাক্য ব্যবহার, পরনিন্দা-পরচর্চা করা থেকে আমাদের জবানকে নিবৃত্ত রেখে সর্বদা সত্য কথা বলা, সুশ্রাব্য বাক্য ব্যবহার ও সদুপদেশ দানে সচেষ্ট হই তাহলে সেটা অবশ্যই ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে আমাদের চোখ, কান, পা ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সর্বদা আল্লাহতায়ালার নিষিদ্ধ কথা এবং কাজ থেকে নিবৃত্ত রেখে ইসলাম-নির্দেশিত হালাল পন্থায় সে সকল ব্যবহার করলে সেটাও ইবাদতরূপে গণ্য হবে। শরীরের যে কোন অঙ্গ অন্যায়-অবৈধভাবে ব্যবহার করলে যেমন গুণাহ হয়, বৈধ ও ইসলাম-অনুমোদিতভাবে ব্যবহার করলে তেমনি নেকী বা ছওয়াব হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, পর-নারীর সাথে যৌন-মিলন যেমন চরম গর্হিত ও গুনাহ্‌র কাজ, নিজ স্ত্রীর সাথে ঐ একই কাজ তেমনি পরম কাংক্ষিত ও ছওয়াবের। মোটকথা, আল্লাহর সৃষ্ট শরীর বা যে কোন কিছু আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় যথাযোগ্য ব্যবহারের দ্বারা যেমন পার্থিব প্রয়োজন পূরণ হয়; তেমিন তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জিত হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সেটাই ইবাদত।

পার্থিব জীবনে আমাদের কায়-কারবার, লেন-দেন, কেনা-বেচা, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান, সামাজিক, রাজনৈতিক অনুশাসন ইত্যাদি সকল ব্যাপারে যদি আমরা ইসলামের বিধান সঠিকভাবে মেনে চলি তাহলে সেটাই হবে ইবাদত। বেচার সময় কম দেয়া, কেনার সময় বেশী নেয়া, মালে ভেজাল মেশানো, অতিরিক্ত মুনাফাখোরী, মওজুতদারী, ফটকাবাজারী, কালোবাজারী, মিথ্যা ও ধোঁকার আশ্রয় নেয়া ইত্যাদি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইসলামে নিষিদ্ধ। অতএব এগুলোতে লিপ্ত হওয়া গুনাহ। অনুরূপভাবে, এসব ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ইসলামের অনুশাসন মেনে সততা, ঈমানদারী ও আমানতদারীর সাথে ব্যবসা পরিচালনা করলে শুধু যে ব্যবসা হবে তাই নয়, সেটা ইবাদত হিসাবেও গণ্য হবে। এরূপ আল্লাহভীরু সৎ ব্যবসায়ীগণ আখেরাতে নবী-সিদ্দিক-শহীদদের সাথে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন। অনুরূপভাবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ে আল্লাহর হুকুম মেনে চলা ও সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বিধান কার্যকর করার নামই ইবাদত-এটাই আল্লাহর প্রতি আমাদের পূর্ণ আনুগত্যের প্রকাশ। আর যদি এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য না করি অথবা আংশিক আনুগত্য করি তাহলে সেটা হবে আল্লাহর অবাধ্যতা বা নাফরমানী। আল্লাহর নাফরমানী করে আল্লাহর কাছে রহমত, নিয়ামত, বরকত ও পুরস্কার যে আশা করে তার চেয়ে আহম্মক আর কে আছে?

আমাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজন, অধীনস্থ লোকজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব প্রমুখ সকলের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়ানুগ আচরণের যে শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে তা নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালন করাই ইবাদত। কোন ক্ষেত্রে এর বরখেলাপ হলে তার দ্বারা ইসলামের শিক্ষা বা আল্লাহ্‌র আদেশকেই অমান্য করা হয়। অতএব এর প্রতিফল দুনিয়াতে যেমন, আখেরাতেও তেমনি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ বলেনঃ



www.pathagar.com

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ـ

অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না, এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট ও দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।" (সূরা নিসা,আয়াত-৩৬)।

ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে দরিদ্র, অভাবী, বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করতে, ক্ষুধার্তকে খাবার দিতে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়, মজলুমকে জালেমের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে। যদি কেউ দুনিয়ার বা নিজের কোন স্বার্থ, উদ্দেশ্য ও আকাংক্ষার বশবর্তী না হয়ে একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে এ কাজে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে এটাই হবে তার জন্য ইবাদত। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ এরূপ কাজে প্রবৃত্ত না হয় তাহলে অবশ্যই সেজন্য তাকে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। অথবা স্বীয় ব্যক্তিগত স্বার্থ, উদ্দেশ্য ও আকাংক্ষার বশবর্তী হয়ে এসব কাজ করলে দুনিয়ায় সেজন্য সুনাম-সুযশ মিললেও, আল্লাহর কাছে এজন্য কোন ফল পাওয়া যাবে না। কেননা নিয়তের উপরই ফল নির্ভরশীল। নিজের জন্য যেটা করা হলো সেটার ফল আল্লাহ দেবেন কেন? আল্লাহর জন্য যেটা করা হয় একমাত্র সেটার ফলই আল্লাহর কাছে আশা করা বাঞ্ছনীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইসলামের জন্য যদি কেউ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দেয় তাহলে সে অবশ্যই শহীদ রূপে গণ্য হবে-এটাই হলো তার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদত আর সে যদি জেহাদের ময়দানে শত্রুর সামনে নিজের পরাক্রম দেখিয়ে বীর যোদ্ধা হিসাবে খ্যাতি অর্জনের আশায় যুদ্ধ করে প্রাণ হারায় তাহলে সে শাহাদতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে, চরম আত্মোৎসর্গ করার পরেও নিয়তের কারণে এটা ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে না। তার বীরত্ব প্রদর্শনের ফলে আল্লাহ তাঁকে দুনিয়ায় যথেষ্ট খ্যাতি দান করলেও, আখেরাতের মহা পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত হবে। এ বিষয়টি সম্যক উপলব্ধির জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) কোন এক জেহাদে জনৈক কাফেরকে পরাভূত করে যখন তার শিরশ্ছেদ করতে উদ্যত হয়েছেন ঠিক সে মুহূর্তে কাফের তাঁর মুখের দিকে থুতু নিক্ষেপ করলো। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) কাফেরের শিরশ্ছেদ করা থেকে বিরত হয়ে তাকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। বিস্মিত-হতবাক কাফের অবাক হয়ে হযরত আলীর কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করলো। হযরত আলী (রাঃ) জবাবে বললেন, প্রথমতঃ তিনি ইসলামের কারণে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কাফেরটিকে পরাভূত করে তার শিরশ্ছেদ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ মুহূর্তে কাফেরটি তাঁর মুখে থুতু নিক্ষেপ করায়



www.pathagar.com

অকস্মাৎ তাঁর মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হয়। ঐ ক্রোধের মুহূর্তে কাফেরকে হত্যা করলে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হতো–আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা হতো না। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাফেরটিকে হত্যা করা থেকে বিরত হন। এ ঐতিহাসিক ঘটনাটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির চরিতার্থতার মধ্যকার পার্থক্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর একটি হচ্ছে উৎকৃষ্ট ইবাদত এবং অন্যটি হলো নফ্স বা প্রবৃত্তির দাসত্ব। প্রকৃত মোমিন বা আবেদ যা কিছুই করে তার একমাত্র লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি, নিজ প্রবৃত্তির দাসত্ব নয়।

আল্লাহ–নির্ধারিত হালাল উপায়ে রোজগার করে নিজের উদর পূর্তি, স্ত্রী–পুত্র–কন্যা ও পরিবার–পরিজনদের ভরণ–পোষণ করাও ইবাদত হিসাবে গণ্য। মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করা, মিষ্টি কথা বলা, এমনকি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি মহব্বত ও সহানুভূতির মনোভাব পোষণ করাও ইবাদত হিসাবে গণ্য। পথের একটি কাঁটা সরানো এমনকি কোন জন্তু–জানোয়ারের প্রতি দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমেও ইবাদতের হক আদায় হতে পারে।

এভাবে দেখা যায়, ইবাদতের অর্থ ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্যমন্ডিত। এক কথায়, আমাদের চিন্তা, কর্ম, আচরণ ইত্যাদি সব কিছু যখন একমাত্র আমাদের স্রষ্টার হুকুম মত পরিচালিত হয় তখনই সেটা হয় ইবাদত আর এর বিপরীতটাকে বলা যায় নাফ্সানিয়াত বা প্রবৃত্তির অনুসরণ। ইবাদত আমাদের দেহ–মনে আনে শান্তি, পার্থিব ও পরকালীন জীবনে আনে সাফল্য ও চিরন্তন আনন্দ। অন্যদিকে আল্লাহর হুকুম বা বিধানকে অস্বীকার করে মানুষের মনগড়া নিয়ম–বিধান অনুসরণ করে চললে দুর্গতির সীমা থাকে না, পৃথিবীতে যেমন অশান্তি সৃষ্টি হয়, আখিরাতেও তেমনি অপেক্ষা করে চরম জিল্লতি।

ইবাদতের আরেকটি দিক হলো আধ্যাত্মিক। আমাদের অধ্যাত্ম–চিন্তা ও অনুশাসনে যখন একমাত্র আল্লাহর হুকুম–নির্দেশ অনুসরণ করা হয় তখন সেটাই হয় ইবাদত। সৃষ্টির প্রদোষ–কাল থেকেই মানুষ অধ্যাত্ম–সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে। মানুষের দেহের যেমন ক্ষুধা আছে, মনেরও তেমনি ক্ষুধা রয়েছে। এ আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশ্যে মানুষ যুগে যুগে সাধনা করেছে। কেউ আত্মাকে প্রাধান্য দিয়ে দেহকে অস্বীকার করেছে, কেউ আত্মার মুক্তি অন্বেষায় দেহ–মনকে করেছে পীড়ন, আবার কেউ পরম সত্তার সাথে মিলনের উদ্দেশ্যে 'সমাধি' লাভ বা ফানাফিল্লাহ্‌র চরম কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ পথ অবলম্বন করেছে। এর কোনটাই স্বাভাবিক পন্থা নয়। ইসলাম শরীর এবং আত্মাকে দুটি বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসাবে গণ্য করে না। দুটির সুষম মিলন ও সমন্বয়েই মানুষের অস্তিত্ব গড়ে উঠেছে। একটিকে অবহেলা করে আরেকটির উন্নতি সম্ভব নয়। দুটির সুষম চর্চা ও সাধনায়ই মানব জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। এ সার্থকতাকে একটি সিঁড়ির সাথে তুলনা করা যায়। সিঁড়িতে অনেকগুলো ধাপ থাকে। এর শীর্ষদেশে আরোহণ করতে চাইলে নীচে থেকে প্রতিটি ধাপই ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করতে হয়। একবারে কেউ শীর্ষদেশে আরোহণ করতে পারে না। শীর্ষদেশে আরোহণের পরও নীচের কোন ধাপ সরিয়ে ফেললে শীর্ষদেশে নিরাপদে থাকা যায় না, হুমড়ি খেয়ে নিপতিত হতে হয়। তাই সিঁড়ির কোন একটি ধাপও উপেক্ষণীয় নয়;



www.pathagar.com

এর প্রতিটি ধাপই গুরুত্বপূর্ণ–কেবল উপরে আরোহণের জন্য নয়, উপরে নিরাপদে টিকে থাকারজন্যও।

ইসলামের দৃষ্টিতে বাহ্যিক ইবাদত কখনো পূর্ণ হতে পারে না মনের প্রশান্তি ও অনুমোদন ছাড়া। মন বা আত্মাই শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে। আত্মার উপলব্ধিই বাহ্যিক ইবাদত নিয়ন্ত্রিত করে আবার অনেক সময় বাহ্যিক ইবাদতের দ্বারা ধীরে ধীরে আত্মার পুষ্প–কোড়ক উন্মোচিত হতে থাকে। এ যেন গাছের গোড়ায় পানি সিঞ্চনের মত। গাছের গোড়ায় মাটিতে পানি সিঞ্চনের ফলে ধীরে ধীরে গাছের প্রবৃদ্ধি ঘটে, ডাল–পালা, পত্র–পুষ্প, ফলমূলে বিকশিত হয়ে পূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হয়। বাহ্যিক ইবাদতের দ্বারাও তেমনি আত্মার বিকাশ ঘটে, আত্মা পরম তৃপ্তি লাভ করে পূর্ণতার স্তরে উপনীত হয়। উদাহরণ স্বরূপ তাহাজ্জুদ নামাযের কথা বলা যায়। তাহাজ্জুদ নামায একটি বাহ্যিক এবং নফল ইবাদত। রাত্রির শেষ প্রহরে বিশ্ব চরাচর যখন গভীর নিদ্রা ও নিস্তব্ধতায় মগ্ন তখন দেহ–মনের পবিত্রতা নিয়ে নীরবে–নির্জনে বিশ্ব–স্রষ্টার একান্ত সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে নামায রূপ ধ্যানে মগ্ন হলে দেহ–মনের যেমন তৃপ্তি ঘটে তেমনি আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্য লাভও সহজহয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে এটাই হলো আধ্যাত্মিকতা। ইসলামে অধ্যাত্ম সাধনার জন্য গৃহত্যাগ করার প্রয়োজন নেই, দেহ বা মন অথবা উভয়টাকেই অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই, কোন অপ্রাকৃত পন্থা অবলম্বনও অসঙ্গত। তবে সন্দেহ নেই, অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা ইবাদতের পূর্ণত্ব ঘটে, দেহ ও মনের পরম তৃপ্তি ও মোমেন–চিত্তের প্রশান্তি লাভ হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশা করি এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণের নামই ইবাদত। জীবনের সকল দিক ইসলামের ছাঁচে ঢেলে সাজানোই ইবাদত। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন, রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত তথা সামগ্রিক জীবনের চিন্তা, কর্ম, আচরণ, অনুশীলন ইত্যাদি সবকিছু যখন ইসলাম–প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হয় তখন সেটাই হয় সত্যিকারের ইবাদত। জীবনের কোন একটি ক্ষেত্রও যদি ইসলামের নির্দেশের বাইরে পরিচালিত হয় তাহলে সেটা হবে পরিষ্কার কুফর। আর কুফর তো স্পষ্টতঃ খোদা–বিরোধিতা। খোদা–বিরোধিতা করে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রত্যাশা করা সম্পূর্ণ বাতুলতা মাত্র। কেবল মাত্র মসজিদ ও কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম–রীতির মধ্যে ইসলাম সীমাবদ্ধ বলে যারা মনে করেন এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষের মনগড়া নিয়ম–রীতি অনুযায়ী চলতে চান, তারা স্পষ্টতঃ চরম বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। ইসলাম সম্পর্কে তাদের সম্যক ধারণা নেই।

সাধারণভাবে চিন্তা করলেও বোঝা যায় যে, যিনি বিশ্ব–জগতের সবকিছু সৃষ্টি করলেন তিনি মানুষের জন্য এমন একটি জীবন–বিধান দান করেছেন যা শুধু মসজিদ ও জীবনের কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম–রীতি বা নামায–রোযা–হজ্ব–যাকাত ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মসজিদের বাইরে বিশ্ব–জগতের সুবিস্তৃত পরিমন্ডল, নামায–রোযা –হজ্ব–যাকাত ছাড়া জীবনের অন্য সকল দিক আল্লাহর মর্জি ও নির্দেশের বাইরে চলবে এটা কীভাবে চিন্তা করা যেতে পারে? চন্দ্র–সূর্য–গ্রহ–তারা পৃথিবীসহ বিশাল সৌরজগত এবং এর অভ্যন্তরস্থ সবকিছু যিনি সৃষ্টি করে সে সকল সুশৃংখলভাবে পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুসম্পূর্ণ


www.pathagar.com

নিয়ম-নীতি তৈরী করে দিয়েছেন, তিনি মানুষের জন্য সম্পূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা না দিয়ে শুধু মসজিদ আর নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাতের মধ্যে তাঁর বিধান সীমাবদ্ধ রেখে জীবনের বিস্তীর্ণ বাকি অংশ মানুষের মর্জিমাফিক চলার স্বাধীনতা দিয়েছেন-এটা কী করে চিন্তা করা যেতে পারে? এরূপ চিন্তা করাও নিঃসন্দেহে শিরক। এরূপ চিন্তার অর্থ হলো, জীবনের নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য মেনে চলা আর বাকি সব ক্ষেত্রে তাগুতের আনুগত্য করা। অথচ আল্লাহ চান মানুষের সর্বাত্মক আনুগত্য। আনুগত্যের দাবিও মূলতঃ তাই। সর্বাত্মক ও নিঃসংশয় না হলে সেটাকে প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যই বলা যায় না। তাছাড়া, এটা কি করে চিন্তা করা যেতে পারে যে, যিনি আমাদের স্রষ্টা, জান-মাল ও সবকিছুর মালিক, পরকালেও একমাত্র তাঁর কাছেই আমাদের চিরন্তন শান্তি জান্নাতের প্রত্যাশা, তিনি আমাদের সামান্য বা আংশিক আনুগত্য দর্শনেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন? আর যে তাগুত-আমাদের সৃষ্টিতে যার কোন হাত নেই, আমাদের জন্ম-মৃত্যু, পরকালীন জীবন- কোথাও যার এতটুকু কর্তৃত্ব নেই, সে কীভাবে আমাদের আনুগত্য আশা করতে পারে?

এটাকে একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝানো যেতে পারে। ইবলিস, আদিতে যে ছিল ফেরেশতাদের নেতা, আল্লাহর একটি মাত্র নির্দেশ অমান্য করায় অভিশপ্ত হয়। অথচ সে আল্লাহকে অস্বীকার করেনি, আল্লাহর ইবাদতে সর্বক্ষণ মশগুল থাকতেও তার কোন আপত্তি ছিল না। মূলতঃ ইবাদতের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েই সে ধাপে ধাপে উন্নতির শীর্ষদেশে আরোহণ করে ফেরেশতাদের নেতা হতে পেরেছিল। তারপর অকস্মাৎ তার চরম পতন ঘটলো-চির অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হলো সে। কারণ সর্বক্ষেত্রে সে নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর আনুগত্য করলেও আল্লাহর একটি নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে-আল্লাহর হুকুমে হযরত আদম (আঃ) কে সেজদা করতে অসম্মত হয়। যার ফলে তার সারা জীবনের ইবাদত ও আনুগত্য অর্থহীন হয়ে পড়ে, সে অভিশপ্ত ইবলিসে পরিণত হয়। আর আমরা যদি কয়েকটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিয়ে জীবনের বাকি সব ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ ও বিধানকে অস্বীকার করি তাহলে আমাদের পরিণতি কী হতে পারে তা কি একবারও ভেবে দেখা উচিত নয়? আল্লাহ তাঁর রসুল (স) কে বলতে বলছেন অকাট্য যুক্তিসহঃ

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ -

অর্থাৎ "আমার কী যুক্তি আছে যে, আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর ইবাদত করবো না?" (সুরা ইয়াছীন, আয়াত-২২)।

আল্লাহ অন্যত্র বলেনঃ

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

অর্থাৎ "আসমান ও যমীন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।" (সুরা মায়িদা, আয়াত-১২০)।



www.pathagar.com

এ যুক্তির সপক্ষে আল্লাহ আরো বলেনঃ

قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا -

অর্থাৎ "বল, আল্লাহ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকব যা আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না?" (সূরা আন্‌আম, আয়াত-৭১)

অতএব, আল্লাহতায়ালার সুস্পষ্ট নির্দেশঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ -

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর (যথার্থ ভয় করার ব্যাখ্যায় হাদীস শরীফে আছে আনুগত্য করা, অবাধ্য না হওয়া, আল্লাহকে সর্বক্ষণ স্মরণ করা, কোন অবস্থায় বিস্মৃত না হওয়া, আল্লাহর কৃতজ্ঞ হওয়া, কৃতঘ্ন না হওয়া) এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা আল ইমরান, আয়াত-১০২)।

ইবাদতের মূল তাৎপর্য এটাই। সর্বশক্তিমান মহান স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনের সাথে কোন অবস্থায় কাউকে বিন্দুমাত্র শরীক না করা, আল্লাহর কাছে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করা, আল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালন করা এবং সর্বোপরি আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রূপে স্থির করে নেয়া-এটাই হলো ইবাদতের সারকথা।



www.pathagar.com

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## ইবাদতের আসল অর্থ

ইবাদতের দুটি দিক। একটি স্রষ্টার, অন্যটি তাঁর সৃষ্টির। ইসলামের পরিভাষায় এটাকে বলা হয়, 'হকুকুল্লাহ্' বা আল্লাহর হক, অন্যটি 'হকুকুল ইবাদ' বা সৃষ্টির হক। শুধু এর একটি পালন করলেই চলবে না, দুটি হক আদায় করলেই ইবাদত পূর্ণতা লাভ করে। যদি কেউ শুধু একটি দিক পালন করেই আত্মতুষ্টি লাভ করে, অন্যটি উপেক্ষা করে তাহলে সে পূর্ণ কামালিয়াত অর্জন করতে পারলো না। যেমন ব্যক্তিগত মানবিক প্রয়োজন, পরিবার, সংসার ও জাগতিক সবকিছু উপেক্ষা করে যদি কেউ শুধু আল্লাহর ধ্যানে ও চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করে সিদ্ধি লাভের প্রয়াস পায় তাহলে সে বাস্তবতাকে চরমভাবে উপেক্ষা করলো। অথচ আল্লাহই মানুষকে নানা জৈবিক প্রয়োজন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, ব্যক্তি মানুষকে পরিবার, সমাজ, সংসার ও জাগতিক অন্যান্য প্রয়োজন–চাহিদা ও দায়িত্ব–কর্তব্য পালনে সুস্পষ্ট দিক–নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করাও নাফরমানীর শামিল। অতএব একদিকে নাফরমানী বা অবাধ্যাচরণ করে অন্যদিকে আল্লাহর বন্দেগী করে তার সন্তুষ্টি বা নৈকট্যলাভ কীভাবে সম্ভব?

পৃথিবীতে আরেক ধরনের মানুষ রয়েছে, যারা শুধু সৃষ্টির সেবা করাই যথেষ্ট মনে করেন। সমাজ–সভ্যতা, মানুষ এমন কি জীবজন্তুর সেবায় হয়ত তাঁরা মূল্যবান অবদান রেখেছেন, নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। এসব ভাল কাজের জন্য দুনিয়ায় তাঁরা অনেক খ্যাতি ও সুযশও অর্জন করেছেন। তাঁদের মৃত্যুর পরেও সমাজ দীর্ঘকাল তাঁদের সৎকার্যাবলীর কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধাবনত হয়। কিন্তু ঈমানহীন সৎকার্যাবলী দুনিয়ার পর্দা ভেদ করে আখেরাত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ দুনিয়াতেই তাঁদের পাওনা কড়ায়–গন্ডায় চুকিয়ে দেন। যেহেতু আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান ছিল না এবং সেই ঈমানের দাবী অনুযায়ী আখেরাতের প্রতি তাদের কোন আস্থা ছিল না, অতএব আখেরাতে তাদের কোন পাওনার প্রশ্নও অবান্তর। আখেরাতে ভাল কাজের ফল পাওয়ার জন্য আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন এবং ঈমানের দাবী অনুযায়ী চিন্তা ও আচরণ পরিশুদ্ধ করা একান্ত অপরিহার্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অতএব শুধু তাঁর ইবাদত করলেই তো চলে, হকুকুল ইবাদের প্রয়োজন কি? মূলতঃ হকুকুল্লাহ্‌র দাবী শুধু একটিই আর হকুকুল ইবাদ হলো সুবিস্তৃত, সীমা–সংখ্যাহীন। অতএব হকুকুল ইবাদ ছাড়া ইবাদতের পূর্ণতাই আসে না। সর্বগুণ ও সর্বশক্তির আধার মহিমান্বিত স্রষ্টার সকল গুণ ও শক্তির মধ্যে অন্য কাউকে অংশীদার না করা, স্রষ্টার কাছে একান্ত আত্মসমর্পণ ও স্রষ্টার আদেশ–নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন, সর্বোপরি সর্বদা তাঁর স্মরণ ও সর্বকাজে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন–এটাই হকুকুল্লাহ।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোন ব্যাপারে কারো এতটুকু মুখাপেক্ষী নন। মানুষ তাঁর ইবাদত করলে অথবা না করলে তাঁর কোন ক্ষতি–বৃদ্ধি নেই। পৃথিবীতে তিনি মানুষ সৃষ্টি না


www.pathagar.com

করলেও তাঁর ইবাদত বা আনুগত্য করার জন্য অসংখ্য সৃষ্টিনিচয় বিরাজমান। তা সত্ত্বেও তাঁর অসীম কুদরতের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তিনি ঘোষণা করলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ـ

অর্থাৎ "আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন এবং মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।" (সূরা যারিয়াত, আয়াত–৫৬)। অতএব ইবাদত করা আমাদের জন্যে কর্তব্য হয়ে গেল। স্রষ্টার আদেশ ও মর্জি সৃষ্টির জন্য অবশ্য পালনীয়। আল্লাহর ইবাদত করা কর্তব্য এ জন্য যে আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা, আমাদের জীবন–মৃত্যু–হাশর–নশরে আল্লাহ ছাড়া আর কারো বিন্দুমাত্র কর্তৃত্ব নেই, অসংখ্য নিয়ামত দ্বারা আল্লাহ আমাদের সকল অভাব পূরণ করেছেন, আল্লাহ আমাদের জীবনকে সঠিক ও সাফল্যের পথে পরিচালনার জন্য এক নির্ভুল জীবন বিধান দান করেছেন এবং সর্বোপরি আল্লাহ আমাদেরকে একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টার উদ্দেশ্য পরিপূরণ ও তাঁর হুকুম প্রতিপালনই সৃষ্টির একমাত্র কর্তব্য।

একথা সত্য যে, আল্লাহ আমাদেরকে একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করলেও তিনি আমাদের ইবাদতের বা কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। মূলতঃ আমাদের জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের জন্যই ইবাদতের প্রয়োজন। জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে পরিচালনা করার মাধ্যমেই শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্য অর্জিত হয়। অনিয়ন্ত্রিতভাবে অনির্দিষ্ট পথে চলে কখনো লক্ষ্য হাসিল সম্ভব নয়। ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের জীবনে আসে নিয়ন্ত্রণ, চিহ্নিত হয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য–পথ এবং পরিণামে অর্জিত হয় ঈপ্সিত শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্য। এই প্রক্রিয়া যদিও চলে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কিন্তু তার পরিণাম ছড়িয়ে পড়ে পরিবার, সমাজ তথা বিশ্বে।

সমগ্র বিশ্ব–জগতের উপর আল্লাহতায়ালার একচ্ছত্র আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বিদ্যমান। সবকিছু আল্লাহ্‌র নিয়ম–নীতি ও নির্দেশ মেনে চলছে। তাই কোথাও কোন বিশৃংখলা নেই, বিপর্যয় সংঘটিত হচ্ছে না। আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া বিশ্ব–জগত এক মুহূর্তের জন্যও চলতে পারতো না, চরম বিপর্যয়ে সব ধ্বংস হয়ে যেতো। মানুষের সমাজেও এই নিয়ন্ত্রণ না থাকলে চরম বিশৃংখলা ও অরাজকতা দেখা দিতে বাধ্য। এ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই আল্লাহতায়ালা যুগে যুগে নবী–রাসুল ও ঐশী কেতাব প্রেরণ করেছেন। পৃথিবীর প্রথম মানুষও তাই যুগপৎ মানুষ ও নবী ছিলেন। আল্লাহর কেতাব ও নবীর অনুসরণ করার অর্থই আল্লাহর আনুগত্য, অন্যকথায় এটাই ইবাদত। আল্লাহর এ নিয়ন্ত্রণ মেনে নিলেই জীবনে শৃংখলা, শান্তি, কল্যাণ ও ঈপ্সিত সাফল্য আসতে পারে–অন্যথায় অশান্তি ও বিপর্যয় অনিবার্য।

প্রকৃতি–জগতের জন্য আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণ মানাকে আল্লাহ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। তাই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক আল্লাহ্‌র আদেশ তারা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছে। কিন্তু জ্বিন ও ইনসানকে তিনি এব্যাপারে কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছেন। এ স্বাধীনতার জন্যই



www.pathagar.com

পরকালে জবাবদিহিতার প্রশ্ন রয়েছে। এ স্বাধীনতা ভোগের পরেও যারা সঠিক পথ বেছে নিতে পারে তাদের জন্যই পরকালে রয়েছে মহা পুরস্কার, ইহকালের জীবনও হয় তাদের জন্য শান্তি ও কল্যাণময়। আর সঠিক পথ বেছে নিতে ভুল করলে অথবা সঠিক পথের সন্ধান পেয়েও অবহেলা ও অবিবেচনাবশতঃ যারা এ পথে চলতে অনীহা প্রদর্শন করে ইহকালের জীবনে তারা যেমন অশান্তি–দুর্ভোগ পোহায়, পরকালের জীবনেও তেমনি কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। অতএব সুস্পষ্ট হলো যে, মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে নিলে তার নিজেরই কল্যাণ সাধিত হয়, আল্লাহর তাতে কোন লাভ–লোকসান নেই। তবে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ায় তিনি নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। স্রষ্টার সুখ তাঁর সৃষ্টির পরিপূর্ণতায়। আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে মানব–জীবন পরিপূর্ণ সাফল্যে বিকশিত হয়ে উঠবে এবং মানব–সমাজে কাংক্ষিত শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হবে। এটা দেখে মানুষের স্রষ্টার চেয়ে বেশী আনন্দিত আর কে হতে পারে? তাই পথচারীর কল্যাণ কামনায় যখন কেউ রাস্তার একটি কাঁটাও সরিয়ে ফেলে তখন আল্লাহ তাতেই খুশী হন। মানুষের কল্যাণে যখন কেউ রাস্তা তৈরী, ছায়াদার, ফলবান বৃক্ষ রোপণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, হাসপাতাল নির্মাণ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ও ক্ষুধার্তের জন্য আহারের ব্যবস্থা করে তখন মানুষের স্রষ্টার চেয়ে বেশী খুশী আর কে হতে পারে? সমাজের অন্যায়, অনাচার, দুর্নীতি, জুলুম, নির্যাতন ও সর্ব প্রকার পাপ–পংকিলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সমাজকে কলুষতামুক্ত করে শান্তিপূর্ণ, কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠায় যারা আত্মনিয়োগ করেন, পৃথিবীতে আল্লাহর সৈনিক তো প্রকৃতপক্ষে তারাই। মানুষের জীবনে, সমাজে ও বিশ্বে মানুষের মনগড়া আদর্শের মূলোচ্ছেদ করে যারা আল্লাহ্‌র শাশ্বত বিধান কার্যকরী করে দুনিয়াকে জান্নাতের বাগিচায় পরিণত করতে চান, আল্লাহ্‌র পূর্ণ আনুগত্য তো তাদের জীবনেই বিদ্যমান। আর আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার চেয়ে বড় ইবাদত আর কী হতে পারে?

প্রকৃতি ও সৌর–জগতে আল্লাহ্‌র নিয়ম ও নির্দেশ কার্যকরী থাকায় সর্বত্র শৃংখলা বিরাজমান। মানুষের সমাজেও ঐরূপ শৃংখলা বজায় রাখার জন্য আল্লাহ্‌র বিধান নাজেল হয়েছে। এ বিধানের দুটো দিক–হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল ইবাদ–সম্পর্কে শুরুতেই উল্লেখ করেছি। হুকুকুল্লাহ সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে, হুকুকুল ইবাদ সম্পর্কেও কিঞ্চিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এবারে হুকুকুল ইবাদ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বলার প্রয়াস পাব।

আল্লাহতায়ালার সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ ঐশী কিতাব আল্–কোরআনের মূল আলোচনার বিষয় দুটি–একটি হলো স্বয়ং আল্লাহ এবং দ্বিতীয়টি হলো মানুষ। এতে আল্লাহর পরিচয়, তাঁর জাত–ছিফাত ও তাঁর বিশাল সৃষ্টি–জগৎ সম্পর্কে আলোচনার সাথে সাথে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে মানুষ সম্পর্কে। মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব, ইহকাল, পরকাল ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সেখানে স্থান পেয়েছে। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক ও কর্তব্য, আল্লাহর প্রেরিত পুরুষদের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য অতঃপর মানুষের পরিচয়, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সমাজ–সংসার ও রাষ্ট্র–ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মাতা–পিতা, স্ত্রী–পুত্র–কন্যা, আত্মীয়–স্বজন, পাড়া–প্রতিবেশী, সামাজিক মানুষ প্রমুখ সকলের প্রতি দায়িত্ব–কর্তব্য, পারস্পরিক লেন–দেন, ব্যবসা–বাণিজ্য, বিচার–সালিস, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিশ্ব–নীতি ইত্যাদি মানব–জীবন ও সমাজ–সভ্যতা সম্পর্কিত সকল



www.pathagar.com

বিষয়ে আল্লাহতায়ালা সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আল্লাহর রসুল হযরত মুহম্মদ (সঃ) এই দিক-নির্দেশনার আলোকেই এক আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করে সর্বকালীন মানুষের জন্য এক সর্বোত্তম স্থায়ী নিদর্শন স্থাপন করে গেছেন। আল্লাহর দেয়া এ দিক-নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনযাপন করা মানুষের কর্তব্য। এ দিক-নির্দেশনার উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবনকে সুন্দর করা, মানুষের অন্তর্নিহিত মানবিক সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ও মানব-সমাজে শান্তি-সৌন্দর্য ও সুষম সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি যেমন আল্লাহর তরফ থেকে ফরয করে দেয়া হয়েছে, এই দিক-নির্দেশনাও তেমনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ। অতএব তা পালন করা আমাদের জন্যঅপরিহার্য।

এখানে আর একটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য। আল্লাহ্ পূর্বোক্ত আয়াতে করীমে উল্লেখ করেছেন যে, জ্বিন ও মানুষকে তিনি একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। যদি আমরা শুধু নামায রোযা, হজ্ব, যাকাতকেই তাঁর ইবাদত হিসাবে গণ্য করি তাহলে জাগতিক আর কোন কাজ করারই আমাদের অনুমতি নেই। অন্যভাবে চিন্তা করলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে দিনে এক ঘন্টার মত সময় প্রয়োজন, রোযা বছরে মাত্র একমাস ফরয, যাকাত কেবল সম্পন্ন লোকদের উদ্বৃত্ত মালের একটি নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের নাম এবং হজ্বও বিত্তবানদের জন্য জীবনে মাত্র একবার আদায় করা ফরয। তাহলে জীবনের বাকি সময় এবং কাজ কি মানুষের নিজেদের ইচ্ছামত করলেই চলবে? উপরোক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী তা কিছুতেই চলতে পারে না। আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং সকল কাজ ও আচরণের দ্বারা আল্লাহ্র ইবাদত করতে হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, অন্যান্য সকল কাজ ও মানবিক দায়-দায়িত্ব পরিহার করে শুধুমাত্র নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত-এগুলো পালন করে জীবন অতিবাহিত করে আল্লাহর পরিপূর্ণ ইবাদত সম্ভব কিনা? এর জবাব হলো যে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। মূলতঃ এটা বাস্তবতার সঙ্গে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। যদি শুধু এটুকু করলেই ইবাদত সম্পূর্ণ হতো তাহলে আল্লাহ জীবনের এত চাহিদা ও সমাজ-সংসারের এত বন্ধন কিছুতেই সৃষ্টি করতেন না। মানব-সৃষ্টির অব্যাহত ধারা ও মানব-সভ্যতার বিকাশ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষও কখনো সাধিত হতো না।

তাই বাস্তবতার আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য যে, আমাদের জীবনের সকল কর্মকান্ড আল্লাহর বিধান মোতাবেক পরিচালনা করলে সেটাই ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে। আর এভাবেই আমরা সর্বসময়ের জন্য আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতে পারি। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতকে মূল কেন্দ্রবিন্দু করে আমাদের জীবনের সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করলেই সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহন করা সম্ভব। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত আমাদের জীবনের সকল কর্মকান্ডকে সুশৃংখল ও সুনিয়ন্ত্রিত করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও কার্যকর হাতিয়ার। এজন্যই আল্লাহ ওগুলোকে আমাদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। কিন্তু শুধু ওগুলোর নামই ইবাদত নয়। ওগুলোর সাথে সাথে জীবনের সকল কর্মকান্ডে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করলেই ইবাদত পূর্ণতা লাভ করে। এ বিধানের নামই ইসলাম। ইসলাম অর্থ শান্তি। পরম স্রষ্টার কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং তাঁর বিধানকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ আত্মসমর্পণ ও আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টাই মোমিন জীবনের লক্ষ্য। এ প্রচেষ্টার নামই ইবাদত। আর একমাত্র এ ইবাদতের জন্যই আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।



www.pathagar.com

# তৃতীয় অধ্যায়

## আল্–কোরআনের আলোকে ইবাদত

ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা, তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা মহাগ্রন্থ আল–কোরআনে বহুসংখ্যক আয়াত নাযিল করেছেন। বিভিন্ন, বিচিত্র প্রেক্ষাপট, দৃষ্টান্ত ও বাক্য–বিন্যাসের দ্বারা ইবাদতের অর্থ, তাৎপর্য ও গুরুত্বকে আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ সম্পর্কে মানব–মনে যত প্রকার প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে, আল্লাহতায়ালা সে সকল প্রশ্নের জবাব সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে আমাদের সামনে পেশ করেছেন।

'উম্মুল কোরআন' (কোরআনের মা) বা কোরআনের মুখবন্ধ হিসাবে খ্যাত সুরা ফাতিহায় আল্লাহ বলেনঃ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ

অর্থাৎ "আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।" (আয়াত–৪)।

এ সুরার শুরুতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পাকজাত ও ছিফাতের বর্ণনা দিয়ে মানব জাতিকে তাঁর নিকট প্রার্থনা করার বা অঙ্গীকার করার ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। এর দ্বারা আমরা সুস্পষ্টভাবে মানব–জীবনের দায়িত্ব–কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। ইবাদত একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য এবং সাহায্যও একমাত্র তাঁর নিকট থেকেই প্রত্যাশা করা যায়, সাহায্য করার প্রকৃত যোগ্যতা আর কারো নেই। অযথা কারো সাহায্য প্রত্যাশা করা যেমন নিষ্ফল, তেমনি সেটা শেরক সমতুল্য। এরপর সুরার পরবর্তী আয়াতে আল্লাহর কাছে সরল পথ (কোন গন্তব্য স্থলে পৌছার অনেক পথ থাকতে পারে, কিন্তু সরল পথ মাত্র একটাই, যেটা সংক্ষিপ্ততমও বটে এবং কামিয়াবীর নিশ্চয়তা দানকারী) প্রদর্শনের প্রার্থনা জানানো হয়েছে। কেননা সরল পথ বা হেদায়াত একমাত্র আল্লাহর হাতে এবং শয়তানের রাস্তা হলো আঁকাবাঁকা, কন্টকাকীর্ণ ও প্রতারণামূলক। সর্বশেষ দুটি আয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোকদের পদাংক অনুসরণ ও বিপথগামী অভিশপ্ত ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার আবেদন জানিয়ে সুরাটি শেষ হয়েছে।

সুরা ফাতিহার প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি শব্দ এত ব্যাপক অর্থবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ যে মানব জাতির হেদায়াতের জন্য এ একটি মাত্র সুরাই যথেষ্ট। এখানে আল্লাহর পরিচয়, মানুষের দায়িত্ব–কর্তব্য ও জীবন চলার সঠিক পথেরও সন্ধান যেমন দেয়া হয়েছে, তেমনি দুনিয়ার নানা বিভ্রান্তিকর মত–পথ ও আদর্শ থেকে দূরে থাকবার কথাও বলা হয়েছে। আর এ মূল কথাগুলোরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো আল–কোরআন মানব–জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন–ব্যবস্থার অভ্রান্ত, নির্ভুল দলিল।

সুরা বাকারার ২১নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ


www.pathagar.com

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -

অর্থাৎ "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।"

আল্লাহকে আমাদের এজন্য ইবাদত করা দরকার যে, তিনি আমাদের এবং আমাদের পূর্ববর্তী সকল মানুষ অর্থাৎ সমগ্র মানব-জাতির স্রষ্টা। এটা একান্ত যুক্তিপূর্ণ যে, সৃষ্টি একমাত্র তার স্রষ্টারই আনুগত্য করবে অন্য কারো নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহতায়ালা সূক্ষ্মভাবে এটা বলে দিয়েছেন যে, বান্দার ইবাদতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই-এটা বান্দারই প্রয়োজন যাতে তারা মুত্তাকী (পরহেজগার) হতে পারে। মুত্তাকী একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর সংক্ষিপ্ত অর্থ হলোঃ সকল কাজ, আমল ও চিন্তায় সর্বদা আল্লাহর স্মরণ ও অনুসরণ, সকল প্রকার খারাপ কাজ চিন্তা ও আচরণ পরিহার এবং একমাত্র সৎ চিন্তা, সৎ কাজ ও সৎ আমলের দ্বারা জীবনে পূর্ণ সাফল্য অর্জন।

সূরা বাকারার ৮৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ -

অর্থাৎ "স্মরণ কর, যখন বনী ইস্‌রাঈলদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন-গরীবদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দিবে,-।" এখানে ইবাদতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম-গরীবদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা, সকল মানুষের সাথে সদালাপ করা, সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়-এগুলো হলো আল্লাহর নির্দেশ। অতএব এগুলো পালন করা ইবাদত।

মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ) এবং তাঁর প্রাণাধিক পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) পবিত্র কা'বা গৃহ নির্মাণের পর উভয়েই আল্লাহর কাছে যে দোয়া করেছিলেন, তার অংশ বিশেষ স্বয়ং আল্লাহ এভাবে উদ্ধৃত করেছেনঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ -



www.pathagar.com

অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত করো। আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সুরা বাকারা, আয়াত-১২৮)। এখানে আল্লাহর প্রিয় নবীদ্বয় আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত হবার প্রার্থনা করার সাথে সাথে তাঁদের বংশধরদের মধ্য থেকে একজন অত্যন্ত অনুগত উম্মত পয়দা করার প্রার্থনাও পেশ করেছেন। এরপর আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করার সাথে সাথে তাঁর কাছে ইবাদতের সঠিক নিয়ম-পদ্ধতিও জানার প্রার্থনা করেছেন। এর দ্বারা সুস্পষ্ট হলো যে, আল্লাহর একান্ত অনুগত হওয়া ইবাদত কবুল হবার পূর্বশর্ত এবং ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি একমাত্র আল্লাহর ইল্‌মের মধ্যেই রয়েছে, নবী-রসূলদের মাধ্যমেই তা লাভ করা সম্ভব। এখানে আল্লাহর যে অনুগত বান্দার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)ই হলেন সে পরম কাংক্ষিত মহামানব যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে চিরস্থায়ীরূপে পৃথিবীতে কায়েম করেছেন এবং ইবাদতের সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি বিশ্বজনকে শিক্ষা দিয়েছেন।

সুরা মায়িদার ৭৬নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

অর্থাৎ "বল, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত কর যে তোমাদের ক্ষতি বা উপকার কোনটা করারই কোন ক্ষমতা রাখে না? আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ ছাড়া ভাল-মন্দ কোন কিছু করার কোন ক্ষমতাই কারো নাই। অতএব, কোন বদ রসম-রেওয়াজের অনুসরণ না করে, ভ্রান্ত মত, পথ ও আদর্শের অনুবর্তী না হয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এক আল্লাহর ইবাদত করাই সর্বদিক দিয়ে যুক্তিসঙ্গত।

সুরা আন্‌আমের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ـ

অর্থাৎ "বল, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে আহবান কর তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে; বল, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না, করলে আমি বিপথগামী হব এবং সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না।" এখানে আল্লাহ স্বয়ং তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (স) কে বলতে বলছেন যেন তিনি কাফিরদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা নিষিদ্ধ। মানুষ আল্লাহকে ত্যাগ করে যখন তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তখন সে হয় বিপথগামী এবং সৎপথ থেকে বিচ্যুত। অতএব একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করেই মানুষ সঠিক পথ পেতেপারে।



www.pathagar.com

সূরা আন আমের ১০২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ـ

অর্থাৎ "এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর, তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক।"

উক্ত সূরার ১৬২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থাৎ "বল, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।" এ আয়াতে আল্লাহ, পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত এমনকি আমাদের জীবন–মৃত্যু অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরা জীবন এবং জীবনের যাবতীয় চিন্তা, কাজ ও আচরণ একমাত্র আল্লাহরই জন্য। এতে বোঝা যায় যে, মানুষ আপন খেয়াল–খুশীমত কোন কিছু করার অধিকার রাখে না, আল্লাহর বিধান মোতাবেক, একমাত্র তারই মর্জি ও ইচ্ছামত চলাই মানুষেরকর্তব্য।

সূরা আরাফের ২০৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ـ

অর্থাৎ "যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা অহংকারে তাঁর ইবাদতে বিমুখ হয় না ও তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁরই নিকট সিজ্‌দাবনত হয়।"

সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ

অর্থাৎ "তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পন্ডিতগণকে ও সংসারবিরাগীগণকে তাদের "আরবাব" রূপে গ্রহণ করেছে এবং মারয়াম–তনয় মসীহকেও। কিন্তু তারা এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র।"



www.pathagar.com

এখানে খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ বলেন, হযরত ঈসা (আ) একমাত্র আল্লাহর দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু খ্রীস্টানরা তাঁর শিক্ষা ভুলে গিয়ে তাঁকে আল্লাহর পুত্র রূপে গণ্য করে (নাউযুবিল্লাহ) চরম শেরক করতে থাকে। তাছাড়া, ঈসা (আ) এর উপর নাযিলকৃত ইঞ্জিল কিতাবও খ্রীস্টানরা বিকৃত করে নিজেদের মনগড়া সবকিছু ধর্মের নামে চালাতে থাকে। এখানে আরবাব শব্দের দ্বারা বিশেষভাবে বুঝানো হয়েছে 'আরবাব' বা হুকুমের মালিক একমাত্র আল্লাহ। হালাল-হারামের সীমা নির্দেশ, বিধান প্রদান ও হুকুম প্রদানের অধিকার একমাত্র আল্লাহর। নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ এগুলো মানব সমাজে প্রবর্তন করেন। ধর্মীয় পন্ডিতগণ আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ্ মোতাবেক শুধুমাত্র তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারেন। কিন্তু দ্বীনের মধ্যে খেয়াল-খুশী মত নতুন কিছু প্রবর্তন করার অধিকার কোন মানুষের নেই। অথচ ইয়াহুদী-খ্রীস্টান ধর্মযাজকগণ স্বীয় স্বার্থে অথবা সমাজ ও শাসকগোষ্ঠীর ইঙ্গিতে বিভিন্ন সময় তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ ও ধর্মীয় বিধান যথেচ্ছা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে নিয়েছে। এখনো সে ধারা তারা অব্যাহত রেখেছে। ফলে তাদের আসল ধর্মের পরিচয় খুঁজে পাওয়া এখন দুষ্কর।

সুরা হুদের ৮৪ ও ৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

**অর্থাৎ** "মাদ্‌য়ানবাসীদের নিকট তাদের ভাই শু'আয়বকে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই, মাপে ও ওজনে কম করো না, আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধিশালী দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য আশংকা করছি এক সর্বগ্রাসী দিনের (হাশরের দিন) শাস্তি। হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপবে ও ওজন করবে। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না।"

এ দুটি আয়াতে আল্লাহতায়ালার ইবাদত করার সাথে সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন-দেনে সততা ও ন্যায়পরায়নতার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। অবৈধ উপায়ে মানুষ অধিক সম্পদের মালিক হতে পারে ঠিকই, কিন্তু তা সাধারণ মানুষকে ফাঁকি দিয়ে বা তাদের রক্ত শোষণ করে গুটিকয় মানুষের উদর স্ফীত করার শামিল। তাছাড়া, অবৈধ পন্থা অবলম্বনের ফলে নিজের নৈতিক চরিত্র নষ্ট হবার সাথে সাথে সামগ্রিকভাবে সমাজকে নৈতিক অধঃপতনে সমূহ প্রেরণা যোগানো হয়। ফলে সমাজে ঘটে চরম বিপর্যয় এবং

www.pathagar.com

আখিরাতে অপেক্ষা করে কঠোর শাস্তি। এ বিপর্যয় ও শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশমত সততা ও ন্যায়পরায়নতার মহত্তম পন্থা। এক্ষেত্রে আল্লাহর এ নির্দেশ যথাযথ পালন করাই ইবাদত। ইবাদত হিসাবে এর মর্যাদাও অতি উচ্চ। কারণ পৃথিবীতে যেসব কারণে মানুষের পদস্খলন হয়, তার মধ্যে অর্থ-ধন-সম্পদ ও বৈষয়িক স্বার্থই প্রধান। তাই এসব ক্ষেত্রে লোভ সংবরণ করে সততা ও ন্যায়পরায়নতার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন আনজাম দিতে পারলে তাদেরকে পরকালে নবী-রসুল-সিদ্দিক-শহীদদের সাথে জান্নাতে স্থান দেয়া হবে বলে হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে।

সূরা নাহ্‌ল-এর ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি।" এখানে আল্লাহ নবী-রসুলদের প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন যে, তিনি তাঁদেরকে দুটি উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেছেন। একটি হলো আল্লাহর ইবাদত কায়েম ও দ্বিতীয়টি হলো তাগুতকে বর্জন করা। তাগুত হলো আল্লাহ-বিরোধী সব কিছু। এর আভিধানিক অর্থ হলো সীমালংঘনকারী, দুষ্কৃতির মূল প্রেরণাদাতা ও মানুষকে বিভ্রান্ত করার শক্তি। শয়তান, কল্পিত দেব-দেবী, মানুষের তৈরী যাবতীয় মতবাদ, আদর্শ, চিন্তা-চেতনা এবং সকল বিভ্রান্তির উপায়-উপকরণ তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। এককথায়, মানুষের জীবনে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর আনুগত্য করা এবং আল্লাহ-বিরোধী সকল চিন্তা, মতবাদ ও কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যেই নবী-রসুলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন।

উক্ত সূরার ৭২ ও ৭৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۝ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝

অর্থাৎ "এবং আল্লাহ তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। তবু কি তারা মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে এবং তারা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? এবং তারা কি ইবাদত করবে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের যাদের আকাশমন্ডলী অথবা পৃথিবী থেকে কোন জীবনোপকরণ সরবরাহ করার শক্তি নাই। এবং তারা কোন কিছু করারই ক্ষমতা রাখে না।"



www.pathagar.com

এখানে আল্লাহতায়ালা একটি মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির পর মানুষের মাধ্যমে মানব-সৃষ্টির এধারা অব্যাহত রেখেছেন। এর পর মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার জন্য যাবতীয় জীবনোপকরণও আল্লাহই আমাদেরকে প্রদান করেছেন। অতএব, আমাদের সৃষ্টি ও জীবন ধারণের জন্য আমরা একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। অন্য কোন শক্তির এক্ষেত্রে এতটুকু কর্তৃত্ব নেই। এ অমোঘ সত্য মানুষ একটু চিন্তা করলেই সহজে বুঝতে পারবে। যে ক্ষেত্রে আমাদের জীবন ও জীবনধারণ একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভরশীল, সেক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত বা তাঁর আনুগত্য করা ছাড়া আর কারো ইবাদত বা আনুগত্য করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। মূলতঃ ইবাদত বা আনুগত্য পাবার উপযুক্ত অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বই থাকতে পারে না। অথচ মানুষ যুগে যুগে মিথ্যা কল্পনা ও মনগড়াভাবে নানা দেব-দেবী, ঈশ্বর-ঈশ্বরী, ভগবান-ভগবতী ও অসংখ্য আরাধ্য বস্তু তৈরী করে তাদের পূজা-অর্চনায় আত্মনিয়োগ করেছে। যদিও এ সমস্ত মনগড়া অসংখ্য আরাধ্য বস্তুর নিজস্ব কোন ক্ষমতাই নাই, তবু তারা নানা আরোপিত শক্তির প্রতিভূ হিসাবে পূজা-অর্চনা পেয়ে আসছে। এ সমস্ত অর্থহীন কাজে লিপ্ত হওয়া কেবল নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক নয়, সর্বশক্তিমান আল্লাহর মুকাবিলায় কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করানো-যা স্পষ্টতঃ শেরক্ এবং শেরকের গুনাহ্ আল্লাহ কখনো মাফ করেন না।

সূরা মারয়াম-এর ৪৪নং আয়াতে আল্লাহ হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর জবানীতে বলেনঃ

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا -

অর্থাৎ "হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করো না। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য।"

দুনিয়ায় সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। সত্য কখনো, কোন অবস্থায় মিথ্যার সাথে আপোষ করে না। এমনকি পিতা-মাতা কিংবা প্রিয়তম কোন ব্যক্তি বা বস্তুর জন্যও সত্যকে জলাঞ্জলী দেয়া যেতে পারে না। হযরত ইব্রাহিম (আ) তাই তাঁর প্রিয়তম পিতা, মূর্তি-পূজক আজরকে শয়তানের ইবাদত পরিত্যাগ করে, সর্বশক্তিমান, দয়াময় আল্লাহর ইবাদত করার আহবান জানাচ্ছেন। কিন্তু মূর্তি-পূজক, পুরোহিত পিতা এ আহবানে সাড়া না দিয়ে বরং পুত্র ইব্রাহিম (আ) কে তাঁর দ্বীন পরিত্যাগ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে এবং অবাধ্য হলে পিতা পুত্রকে হত্যা করার হুমকি দেয়। পুত্র ইব্রাহিম (আঃ) বাতিলের হুমকিতে বিন্দুমাত্র ঘাবড়ার পাত্র নন। কারণ তিনি বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই তিনি উল্টা তাঁর পিতা, পিতার সমাজ-ধর্ম ও আরাধ্য সকল দেব-দেবীর বিরুদ্ধে প্রবল চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে একসাথে তাদের সকলকে পরিত্যাগ করে বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক, দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ পুনর্বার ইব্রাহিম (আ) এর জবানীতে বলেনঃ

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا -

www.pathagar.com

অর্থাৎ "আমি তোমাদের থেকে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর তাদের থেকে পৃথক হচ্ছি, আমি আমার প্রতিপালককে আহবান করি, আশা করি আমার প্রতিপালককে আহবান করে আমি ব্যর্থকাম হব না।" (সূরা মারয়াম, আয়াত- ৪৮)।

এ আয়াতদ্বয়ের দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হলো যে, কোন কিছুর বিনিময়েই বাতিলের সাথে সমঝোতা করা যেতে পারে না। আল্লাহর আনুগত্য করা, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা এবং তাগূতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার শিক্ষাই ছিল নবী-রসূলদের শিক্ষা। মানব জাতিকেও এ শিক্ষা দেয়ার জন্যই আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন। এজন্য প্রয়োজনে নিকটাত্মীয় বা প্রিয়তম বস্তুর মায়াও পরিত্যাগ করতে হবে, সমাজ-সংসারকেও বর্জন করতে হবে, তাগূতের বিরুদ্ধে করতে হবে আপোষহীন, মরণপণ সংগ্রাম। এ সংগ্রামের মধ্যেই মোমিনের ঈমানের পরীক্ষা। এ পরীক্ষা ছাড়া কোন যুগে কোন সাধারণ মুসলমান তো দূরে থাক, কোন নবী-রসূলও স্বীয় মিশনের কাজ আনজাম দিতে সক্ষম হননি।

সূরা আম্বিয়ার ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ أَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنَ۔

অর্থাৎ "আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রসূল প্রেরণ করিনি যার প্রতি এই ওহী ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, সুতরাং আমারই ইবাদত কর।"

সূরা হাজ্জ-এর ১১নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۔

অর্থাৎ "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সাথে, তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে ও আখিরাতে, এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।"

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ মানুষের ঈমান, আমল ও মানসিকতার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই আল্লাহর ইবাদত করে এমন দ্বিধা-সংকোচের মধ্যে যাতে বাইরে থেকে তাদেরকে ঈমানদার মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ফলে তারা ভাল অবস্থায় খুশী-খোশহালে ঈমান আনার কথা বললেও বিপদের মুহূর্তে কেটে পড়ে, এমনকি ঈমানের দাবিও অস্বীকার করে বসে। এ অবস্থায় দুনিয়ায়ও যেমন তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আখেরাতেও ভয়াবহ শাস্তি তাদের জন্য অপেক্ষা করে। এ আয়াতের দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে বা রাব্বুল আলামীনের হুকুম-নির্দেশ মত চলতে গেলে অবশ্যই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়। নবী-রসূল এবং সাহাবায়ে কেরাম এমনকি, যুগে যুগে তাঁদের পথ ধরে যারা আল্লাহর বিধানকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করেছেন তাঁদের সকলেই এ কঠিন



www.pathagar.com

অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। এ যুগেও যাঁরা তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে চলতে চান, তাঁদেরকেও ঐ একই পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হয়। শুধু নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের মাধ্যমে যাঁরা আল্লাহর ইবাদত করা যথেষ্ট মনে করেন, তাঁদেরকে কখনো এরূপ অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় না। আল্লাহ্‌র বিধানকে যারা পরিপূর্ণরূপে কায়েম করতে চান-যেরূপ নবী-রসূল, সাহাবায়ে কেরাম করে গেছেন, কেবল তাঁদেরকেই এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এর মাধ্যমেই দুর্বল ঈমান ও মজবুত ঈমানের পরীক্ষা হয়। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারলে দুনিয়ায় যেমন, আখিরাতেও তেমনি সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

সূরা নূরের ৫৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ
الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ
لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ۔

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে অবশ্যই খেলাফত দান করবেন, যেমন তিনি খেলাফত দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী।"

উপরোক্ত আয়াতে করীমে আল্লাহ বান্দার প্রতি তাঁর ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। বান্দা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে সৎকর্ম করলে দুনিয়ায় তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই তাঁর প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন পূর্ববর্তীদের। তাদের দ্বীনকেও তিনি সুদৃঢ় করবেন, যে দ্বীন আল্লাহ স্বয়ং তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। এছাড়া, তাগূতের ভয়-ভীতির মুকাবিলায় তাদেরকে নিরাপত্তা দান করাও আল্লাহ তাঁর নিজের দায়িত্ব বলে মনে করেন। এ ধরনের সৎকর্মশীল ঈমানদার। ব্যক্তিরাইআল্লাহরইবাদত করে এবং তাদের চিন্তা, কর্ম ও জীবনায়নে কখনো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করে না। কিন্তু এর অন্যথাকারীগণ অবশ্যই আল্লাহর নাফরমান বান্দা হিসাবে গণ্য, সত্যকে তারা পরিত্যাগ করেছে।

এখানে 'প্রতিনিধিত্ব' শব্দের ব্যাখ্যা দরকার।



www.pathagar.com

**প্রথমতঃ** প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তির নিজস্ব কোন বক্তব্য থাকে না। যার প্রতিনিধিত্ব করা হয় সর্বাংশে তিনি তার আনুগত্য করেন এবং তার বক্তব্য ও নির্দেশই তিনি যথার্থরূপে অন্যের কাছে তুলে ধরেন। নিজের মনগড়া বক্তব্য বা নির্দেশ প্রদান করলে তখন আর অন্যের প্রতিনিধিত্ব করা হয় না।

**দ্বিতীয়তঃ** প্রতিনিধিকে অবশ্যই যোগ্যতার পরিচয় দিতে হয়। যার প্রতিনিধিত্ব করা হয় তিনি যত বড় বা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী তার প্রতিনিধিত্ব সে হিসাবে যোগ্যতাসম্পন্ন হয়। একজন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি অন্য একজন সাধারণ মানুষ হতে পারে। কিন্তু একজন রাজা–বাদশাহ বা অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অবশ্যই বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন। অতএব, দুনিয়ায় আল্লাহর খেলাফতের মহান দায়িত্ব পালন করতে হলে অবশ্যই কিছু বিশেষ গুণাবলী দরকার। এ গুণাবলীর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলোঃ ঈমান, আনুগত্য, আত্মসমর্পণ, নেক আমল ও সকৃতজ্ঞ প্রশান্ত চিত্ততা।

সূরা আন্‌কাবুত–এর ১৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ
وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ -

অর্থাৎ "তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত কেবল মূর্তিপূজা করছো এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছো, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা কর তারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নয়। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহর নিকট এবং তাঁরই ইবাদত কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।"

উক্ত একই সূরার ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ -

অর্থাৎ "হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।'

শেষোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যায়ঃ আল্লাহর মু'মিন বান্দাগণ পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীনের কাজ করতে গিয়ে অনেক বিপদ–বাধার সম্মুখীন হয়, তাদের কাছে অনেক সময় পৃথিবী অনেক সংকীর্ণ মনে হয় অর্থাৎ এ পৃথিবীতে তাদের জীবনধারণ সুকঠিন হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যেই একথা বলছেন।



www.pathagar.com

অর্থাৎ এ জীবনটাই শেষ নয়; এ জীবনের পরেও আরেক অনন্ত জীবন রয়েছে। অন্যদিকে, কাফেরদের জন্যও এটা সত্য যে, দুনিয়ার জীবনে তারা যতই দাপট দেখাক না কেন, মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবন রয়েছে, সেখানকার শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায়ই তাদের নেই।

সূরা সা'বা–এর ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ
يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى ۚ
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝

অর্থাৎ "এদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন এরা বলে তোমাদের পূর্ব–পুরুষ যার ইবাদত করত এ ব্যক্তিই তো তার ইবাদতে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়া' এরা আরো বলে, 'এটা (আল–কোরআন) তো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু নয়' এবং কাফেরদের নিকট যখন সত্য আসে, তখন তারা বলে, 'এটা এক সুস্পষ্ট যাদু"।

সূরা ফাতির–এর ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا
مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ۚ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ
بَيِّنَتٍ مِنْهُ ۚ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۔

অর্থাৎঃ "বল, 'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক সেসব দেব–দেবীর কথা ভেবে দেখেছো কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও, অথবা আকাশমন্ডলীর সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে কি? না কি আমি তাদের এমন কোন কিতাব দিয়েছি যার প্রমাণের উপর এরা নির্ভর করে?' বস্তুত জালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়।'

সূরা যুমার–এর ১ নং ও ২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۔

অর্থাৎঃ "এ কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট থেকে।



www.pathagar.com

আমি তোমার নিকট এ কিতাব যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি, সুতরাং আল্লাহর ইবাদত কর তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে।"

এ আয়াতদ্বয়ের দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হলো যে, ইবাদতের নির্দেশিকা হলো মহাগ্রন্থ আল-কোরআন। সমগ্র মানবজাতির জন্য এটা হলো একমাত্র সঠিক হেদায়াত। এখানে জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল সমস্যা সমাধানের দিক-নির্দেশনা এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন পরিচালনার সকল বিধান সন্নিবেশিত রয়েছে। এটা যেমন ব্যক্তি-জীবনের গাইড-বুক, তেমনি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবনেও এটাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সঠিক দিক-নির্দেশক ঐশীগ্রন্থ। এ গ্রন্থে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত সম্পর্কে যেমন আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে, জীবন ও জগতের অন্যান্য সব ক্ষেত্রে তেমনি আল্লাহর নির্দেশ বিদ্যমান। প্রথমোক্ত নির্দেশ মানা যেমন ফরয শেষোক্ত নির্দেশ মানাও তেমনি কর্তব্য। এটাই পরিপূর্ণ ইবাদত। এ ইবাদতের মাধ্যমেই আমাদের ইহকাল ও পরকালের শান্তি ও সাফল্য নির্ভরশীল।

উক্ত সূরার ১১-১৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ إِنِّيْ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎঃ "বল, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি, আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করতে; আদিষ্ট হয়েছি, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই।' বল, 'আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি মহাদিবসের শাস্তির।' বল, আমি ইবাদত করি আল্লাহরই তাঁর প্রতি আমার আনুগত্য একনিষ্ঠ রেখে। অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত কর।' বল 'কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জেনে রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।"

এখানে রাসূল (স) এর জবানীতে মহান আল্লাহ যা বলছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর ইবাদতে একনিষ্ঠ হওয়া দরকার। সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও একান্ত আত্মসমর্পণ একনিষ্ঠ ইবাদতের জন্য অপরিহার্য। শুধু নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি কতিপয় ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করে অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য না করলে সেটাকে মোটেই আনুগত্য বলা চলে না, আত্মসমর্পণ তো নয়ই।

সূরা কাফিরূন-এ আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلَآ أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۝ وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝ وَلَآ أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ


www.pathagar.com

وَلِيَ دِيْنِ ۝

অথাৎঃ "বল, হে কাফিরগণ! 'আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর। এবং তোমরা ত তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি, এবং আমি ইবাদতকারী নই তার যার ইবাদত তোমরা করে আসছো এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।"

এখানে হক এবং বাতিলকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মক্কায় ইসলাম প্রচার কালে কিছু কাফের রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট একটি আপোষ প্রস্তাব উথাপন করেছিল এ মর্মে যে, আমরা পর্যায়ক্রমে কিছুদিন আপনার রবের ইবাদত করি, অনুরূপভাবে আপনিও কিছুদিন আমাদের দেবতার পূজা করুন। এভাবে একটি মিশ্র দ্বীন ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি হোক। এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতেই আল্লাহতায়ালা উক্ত সুরা নাযিল করেন। আলো এবং অন্ধকার, সত্য এবং মিথ্যা, হক এবং বাতিলের সহ-অবস্থান কিছুতেই সম্ভব নয়। একদিকে বিশ্ব-জগতের মালিক ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদত, অন্যদিকে মানুষের মনগড়া, হাতেগড়া মূর্তির পূজা-এদু'য়ের সমন্বয় কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সর্বকালের মানুষের জন্য তাই আল্লাহতায়ালার এ সুস্পষ্ট ঘোষণা। সুরা এখলাসে এ ঘোষণার দীপ্ত, মহীয়ান বাণীই যেন আরো কিছুটা ভিন্নতর প্রেক্ষায় রাব্বুল আলামীনের অনন্য পরিচিতি হিসাবে সমুজ্জ্বল প্রতিভাসে ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ

الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

অর্থাৎঃ "বল, 'তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি, এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই" (সুরা এখলাস)।

এত সংক্ষেপে অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহান আল্লাহর গভীর তাৎপর্যময় সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়ার পর মানুষের মনে আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আল্লাহর এ পরিচয় একান্তভাবে স্মরণ রাখাঅত্যাবশ্যক।

আল-কোরআনের সর্বশেষ সুরা নাস-এ আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ

الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝


www.pathagar.com

অর্থাৎ "বল, 'আমি শরণ নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের,

'মানুষের অধিপতির

'মানুষের ইলাহ–এর নিকট

'আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে

'যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে

'জিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে"

আল্–কোরানের এ সর্বশেষ সূরার প্রথমাংশের তিনটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালার বহু গুণাবলীর মধ্যে মাত্র তিনটি বিশেষ ছিফাতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ তিনটি গুণই এত মৌলিক, অনন্য ও ব্যাপক অর্থবোধক যে, এর কোন তুলনাই নেই। প্রথম গুণটি হলো 'রব' বা প্রতিপালক। আরবী 'রব' শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে, এর দ্বারা বুঝায় যিনি সৃষ্টি করার পর সৃষ্ট জীবের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টিদানকারী, তার সব ধরনের জীবনোপকরণ প্রদানকারী, সর্ব কর্তৃত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারী। দ্বিতীয় গুণ হলো 'মালিক' বা অধিপতি। কোন বিষয়ের উপর যার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও আধিপত্য তাকেই 'মালিক' বলা হয়। এখানে মালিকিন্নাস্ বলতে মানুষের স্রষ্টা এবং তার উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের অধিকারী মহান সত্তার পরিচয়ই তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় গুণটি হলো 'ইলাহ'। 'ইলাহ' শব্দটিকে একটি মাত্র বাংলা শব্দ দ্বারা বুঝানো দুষ্কর। এর সংক্ষেপ অর্থঃ যিনি আমাদের সর্বপ্রকার ইবাদত পাওয়ার যোগ্য, যিনি আমাদের একনিষ্ঠ আনুগত্য ও ঐকান্তিক আত্মসমর্পণের হকদার, যার ইবাদত–বন্দেগী হবে সামগ্রিক, তাতে অন্য কারো কোন অংশ থাকবে না–এমন সত্তাকেই ইলাহ্ বলা যেতে পারে। এখানে তিনটি গুণবাচক শব্দের আগেই মানুষ শব্দটি সন্নিবেশিত হয়েছে। অর্থাৎ যিনি মানুষের একমাত্র প্রতিপালক, অধিপতি ও ইলাহ্– আমরা সেই মহান আল্লাহ্রই শরণ বা আশ্রয় নিচ্ছি। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করে প্রতিপালন করছেন, জীবন চলার বিধান দিয়েছেন, আমাদের জীবন ও জগতের উপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব করে চলেছেন এবং আমাদের ইবাদত–বন্দেগী একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

এ সূরার দ্বিতীয় অংশের তিনটি আয়াতে খোদা–বিরোধী শক্তি বা শয়তানের কথা বলা হয়েছে। শয়তানের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তাকে আত্মগোপনকারী, কুমন্ত্রণাদাতা ও অনিষ্টকারী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মানুষের সকল কাজ ও চিন্তার মধ্যে শয়তান গোপনে লুকিয়ে থেকে মানুষকে নানা কুমন্ত্রণা দিয়ে বিপদগামী করার প্রয়াস পায়। মানুষের অনিষ্ট সাধনই তার একমাত্র লক্ষ্য। শয়তানের প্ররোচনা ও অনিষ্ট থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল আল্লাহর শরণ বা আশ্রয়। অতএব, একমাত্র



www.pathagar.com

আল্লাহর ইবাদত করতে হবে সেই মহান সত্তার পূর্ণ আনুগত্য ও একান্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এবং সেই সাথে মানুষের চির শত্রু, প্রবঞ্চক শয়তানের অনিষ্টকর প্ররোচনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্বদা আল্লাহর সাহায্য, রহমত ও মদদ প্রার্থনা করতে হবে।

এখানে শয়তানের পরিচয় দিতে গিয়ে আরো বলা হয়েছে যে, শয়তান যদিও একটি বিশেষ সত্তার নাম, কিন্তু সে শয়তান সর্বদা আত্মগোপনকারী। নিজস্ব পরিচয়ে সে কখনো কারো কাছে যায় না। নিজের পরিচয় গোপন রেখে, বন্ধু বা শুভাকাংক্ষী হিসাবে সে মানুষের মন–মানসিকতা, চিন্তা–কর্ম ও আচরণের মধ্যে সন্তর্পণে অনুপ্রবেশ করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। এভাবে যখন সে কোন মানুষকে বশীভূত করে তখন সে মানুষই হয় শয়তানের প্রকাশ্য প্রতিভূ। অতঃপর এসব মানুষই অন্য মানুষকে শয়তানী কাজে প্ররোচিত করতে থাকে। এভাবে জিন ও ইনসানের মধ্যে শয়তানের অসংখ্য অনুসরণকারী রয়েছে–যারা প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে বিপদগামী করার জন্য সর্বদা তৎপর। শয়তানের এ অপতৎপরতা মানুষের ব্যক্তি–জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ে বিস্তৃত। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের মোকাবিলায় শয়তান তার প্রতিভূদের মাধ্যমে তার নিজস্ব বিধান কার্যকরী করতে তৎপর। বিভিন্ন যুগ, দেশ ও সমাজে এ শয়তানী বিধানের রূপ–বিভিন্নতা রয়েছে, কিন্তু মূলতঃ সর্বদাই মানব সমাজের জন্য তা অনিষ্টকর। কখনো গণতন্ত্রের নামে, কখনো সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম, ধর্মনিরপেক্ষতা, পুঁজিবাদ বা অন্য যে কোন মন–ভুলানো নামে মানব সমাজে তা প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু দুনিয়ায় মূলতঃ দুটি মাত্র বিধানই রয়েছে–একটি আল্লাহ্‌র বিধান, অন্যটি আল্লাহ–বিরোধী তাগূতী বা ইবলিসী বিধান। আল্লাহ্‌র বিধান ছাড়া অন্য সব বিধানই তাগূতী বিধানের অন্তর্ভুক্ত। একটি মানব সমাজকে শান্তি, শৃংখলা, প্রগতি ও সম্প্রীতির আলোকোজ্জ্বল পথের সন্ধান দেয়, অন্যটি অশান্তি, বিশৃংখলা, ধ্বংস ও অনিবার্য অনিষ্টের অন্ধকার গহ্বরের অতলে ঠেলে দেয়। একটি মানব জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি, অন্যটি মানব জীবনের ব্যর্থ পরিণতির অনিবার্য সোপান। তাই শয়তানের প্ররোচনা ও অপতৎপরতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং জীবনকে সাফল্যের মঞ্জিলে উপনীত করার জন্য আল্লাহর শরণ বা আশ্রয় একান্ত আবশ্যক। আল্লাহর শরণ বা আশ্রয় ছাড়া ইবাদতেও একনিষ্ঠতা ও প্রশান্তি আসে না। এ বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই হয়ত মহান স্রষ্টা তাঁর মহাগ্রন্থ আল্–কোরানের সর্বশেষ সূরায় এর অবতারণা করেছেন।

ইবাদতের পূর্ণতা ও কবুলিয়াতের জন্য আর একটি বিষয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সেটা হলো 'তওবা'। উপরোক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, আমাদের জীবনে


www.pathagar.com

দায়িত্ব অনেক। জীবনের প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র পথে চলতে গিয়ে আমাদের পক্ষে ভুল করা স্বাভাবিক। যারা জীবনের প্রতিক্ষেত্রে আল্লাহর অবাধ্যতা করে কাফের হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে, তারাও যেমন তওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে, তেমনি যারা মোমিন বান্দা তারাও অনেক সময় ভুলে অথবা অসতর্কতাবশতঃ অবাধ্যাচরণ করলে তওবা করে আল্লাহ্‌র ক্রোধ থেকে রক্ষা পেতে পারে। আল্লাহ আমাদের স্বভাবের মধ্যে যেসব দুর্বলতা দিয়ে পয়দা করেছেন, তাতে আমাদের জন্য ভুল করা অস্বাভাবিক নয়। মানুষ এবং ফেরেশতাদের মধ্যে এটাই পার্থক্য। ফেরেশতারা ভুল করেন না; তাদেরকে আল্লাহ্‌ সে ক্ষমতা দেননি। কিন্তু মানুষকে তৈরী করেছেন এমন স্বাধীন বুদ্ধি–বিবেক দিয়ে, যে স্বাধীন বুদ্ধি–বিবেক প্রয়োগ করে সে সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারে, আবার বিপথগামীও হতে পারে। আবার বিপথে চলতে চলতে অকস্মাৎ পথের সন্ধানও পেয়ে যেতে পারে। সঠিক পথে চলতে চলতেও অনেক সময় সাময়িক পদস্খলন ঘটতে পারে। এ সকল অবস্থায় আল্লাহ তওবার দরোজা উন্মুক্ত রেখেছেন এবং তওবা কবুলের জন্য বা বান্দাকে ক্ষমা করার জন্যও তিনি সর্বদা প্রস্তুত। অনুতপ্ত বান্দার অশ্রুসিক্ত মুখাবয়ব আল্লাহ্‌র খুবই পছন্দ। তাই সর্বাবস্থায় অনুতপ্ত চিত্তে তওবার মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের সকল প্রার্থনা নিবেদন করা উচিত। তবে সতর্ক থাকা উচিত, ইচ্ছাকৃত ভুল যেন না হয় অথবা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে।

তওবার অর্থ হলো প্রত্যাবর্তন। মানুষ ভুল করে অনুতাপ–অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়ে যখন আল্লাহর কাছে তওবা করে তখন আল্লাহ তার কৃত অপরাধ মাফ করে তাকে পূর্বস্থানে অর্থাৎ অপরাধ করার পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। তওবা কবুলের অন্যতম শর্ত হলো, তওবাকারীকে পূর্বকৃত অপরাধের পুনরাবৃত্তি না করার শপথ নিতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানবিক দুর্বলতার কারণে পূর্বকৃত অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে সেজন্য আর তওবা করা যাবে না কিংবা আল্লাহ পুনর্বার তা ক্ষমা করবেন না এমন নয়। আল্লহ এতই ক্ষমাশীল যে তাঁর কাছে সর্বাবস্থায় ক্ষমা এত্যাশা করা যেতে পারে। এ প্রত্যাশা না রাখাও অসঙ্গত তবে ভুলক্রমে অথবা অসতর্কতাবশতঃ একবার কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়া এবং বার বার তার পুনরাবৃত্তি ঘটার মধ্যকার যে পার্থক্য সেটাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে।

মানুষ যেহেতু ভুল–ত্রুটির উর্ধে নয়, তাই সর্বদা তাকে তওবার গুরুত্ব অনুধাবন করা উচিত। পরম নিষ্ঠার সাথে ইবাদতকারী ব্যক্তিও নিজেকে মানবীয় ত্রুটি–বিচ্যুতির সম্পূর্ণ উর্ধে বলে দাবী করতে পারে না। তাই তওবা প্রত্যেকের জন্যই জরুরী। মূলতঃ তওবা হলো মানুষের মৌলিক গুণাবলীর একটি। বেহেশত

www.pathagar.com

থেকে বিতাড়িত হবার আগে অভিশপ্ত ইবলিস এবং আদি মানব হযরত আদম (আ) একই অপরাধে অভিযুক্ত ছিলেন। তারা উভয়েই আল্লাহতায়ালার অবাধ্যাচরণ করেছিলেন। ইবলিস হযরত আদম (আ) কে সেজদা না করে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে আর হযরত আদম (আ) নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে আল্লাহর আদেশ অমান্য করেন। অপরাধ ছিল একই। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুটি বিরাট পার্থক্য চোখে পড়ে।

**প্রথমতঃ** ইবলিস যখন আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করেছিল তখন তাকে এ গর্হিত কাজে প্ররোচিত করার কেউ ছিল না, শয়তানের জন্ম তখনো হয়নি। তাই এ অপরাধের দায়–দায়িত্ব সম্পূর্ণ তার উপরই বর্তায়। কিন্তু আদম–হাওয়ার অবাধ্যতার প্রেক্ষিত ছিল ভিন্ন। তাঁরা প্ররোচিত হয়েছিলেন শয়তানের দ্বারা। শয়তান ভাল মানুষের রূপে পরম শুভাকাংক্ষী হয়ে দীর্ঘদিন যাবত নানাভাবে প্ররোচনা দেবার পর মানবীয় দুর্বলতার এক অশুভ মুহূর্তে তাঁরা আল্লাহর হুকুম বিস্মৃত হয়ে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে অবাধ্যতার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। অপরাধ দুটো সমান হলেও প্রেক্ষাপটের বিচারে এবং কার্য–কারণ বিশ্লেষণে দুটোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য চোখে পড়ে।

**দ্বিতীয়তঃ** ইবলিস আল্লাহর আদেশ অমান্য করে সেজন্য সে এতটুকু অনুতপ্ত না হয়ে বরং চরম অহমিকা ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। ফলে সে হয়েছে অভিশপ্ত। অন্যদিকে হযরত আদম (আ) অপরাধ করার সাথে সাথে নিজের ভুল উপলব্ধি করে চরমভাবে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট তওবা করেন বা ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আল্লাহ সে অনুতপ্ত চিত্তের তওবা কবুল করে তাঁকে ক্ষমা করে দেন। ফলে শয়তান বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয়ে দুনিয়ায় আসে অভিশপ্ত হিসাবে, অন্যদিকে হযরত আদম (আ) দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ অবস্থায় তাঁর গভীর অনুশোচনাপ্রসূত তওবার বদৌলতে। এ ঘটনার উল্লেখ করে আল্লাহ বলেনঃ

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অর্থাৎ "অতঃপর আদম তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলো। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সুরা বাকারা,আয়াত–৩৭)।

অতএব, ইবাদতের অর্থ হলো আল্লাহর উপর সুদৃঢ় ঈমান, সর্ব চিন্তা, কাজ ও আচরণে তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং সর্বাবস্থায় তাঁর প্রতি একান্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে অনুতাপদগ্ধ চিত্তে তাঁর ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করা। মানব–জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য, প্রকৃত কল্যাণ ও সাফল্য এর মধ্যেই নিহিত।



www.pathagar.com

# চতুর্থ অধ্যায়

## খেলাফতের দায়িত্ব

আল্লাহতায়ালা মানুষ সৃষ্টির আগে ফেরেশ্‌তাদের ডেকে তাঁর পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করলেন এভাবেঃ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً -

অর্থাৎ "আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই।" (সূরা বাকারা, আয়াত-৩০)। আল্লাহর এ ঘোষণা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেছেন। মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় কোন মর্যাদার কথা কল্পনাও করা যায় না। এজন্য মানুষ আশরাফুল মখলুকাত' বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

মর্যাদার সাথে দায়িত্বের প্রশ্ন জড়িত। যার মর্যাদা যত বড় তার দায়িত্বও তত অধিক। প্রকৃতপক্ষে, এ দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে আন্‌জাম দেয়ার উপরই মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকা নির্ভর করে। সুষ্ঠুরূপে দায়িত্ব পালন করলে মর্যাদা শুধু অক্ষুণ্ন থাকে তাই নয়; মর্যাদা অধিক বৃদ্ধি পাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে, সুষ্ঠুরূপে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকা দূরে থাক, চরম জিল্লতিই হয় তখন ললাট-লিখন। তাই মর্যাদা সম্পর্কে যেমন সদা সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়, তেমনি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে এর সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য সুষ্ঠুরূপে পালনেও সদা সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন।

কাউকে প্রতিনিধি মনোনীত করার পর প্রথমতঃ তার কাছ থেকে পূর্ণ আনুগত্যের শপথ নেয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ তাকে উপযুক্ত গাইডেন্স বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব-কর্তব্য বুঝিয়ে দেয়া হয়। তৃতীয়তঃ তাকে দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও উপকরণাদি সরবরাহ করা হয়। এভাবে শিখিয়ে-পড়িয়ে প্রতিনিধিকে যখন দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত করা হয় তখন তার কিছুটা স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু সে স্বাধীনতা তার আনুগত্যের শপথের বাইরে নয়; তাকে দেয়া গাইডেন্সের অতিরিক্ত কিছু নয়। সীমাতিরিক্ত কিছু করলে সেজন্য অবশ্যই তাকে জবাবদিহি করতে হয় এবং উপযুক্ত শাস্তিও পেতে হয়।

আল্লাহতায়ালা দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি পাঠানোর পূর্বেও তার কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا -

অর্থাৎ "স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম-সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলে, 'নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী রইলাম।' (সূরা আ'রাফ, আয়াত-১৭২)।



www.pathagar.com

এভাবে আনুগত্যের শপথ নেয়ার পর মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়। কিন্তু দুনিয়ায় আসার পর অনেক মানুষ তার ওয়াদার কথা ভুলে যায়, স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে হয় গাফেল। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ٥

অর্থাৎ "যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা বাকারা, আয়াত-২৭)

প্রধানতঃ শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা, এ ছাড়া, বিধর্মীর ঘরে জন্মগ্রহণ ইত্যাদি কারণে অনেকেই তার ওয়াদা সম্পর্কে থাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অথচ জন্মের সময় সব শিশুই থাকে নিষ্পাপ, তখন ইসলামই থাকে তাদের ধর্ম। কিন্তু পরিবেশের কারণে, বিধর্মী বাবা-মা এবং শয়তানের প্রত্যক্ষ প্ররোচনা কিংবা মানুষরূপী শয়তানের প্রতিনিধিদের প্রভাবে নিষ্পাপ শিশু ধীরে ধীরে বিপথগামী হয়, তার প্রকৃত সত্তার কথা ভুলে যায়, আল্লাহর কাছে প্রদত্ত পবিত্র ওয়াদার কথা হয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত। বয়ঃপ্রাপ্তির পরও সে তার জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা প্রয়োগে হয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এসব পথহারা মানুষের জন্যই যুগে যুগে আল্লাহতায়ালা নবী-রসুলপ্রেরণকরেছেন।

নবী-রসুল প্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আল্লাহর কাছে কৃত তার পবিত্র ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া, তার প্রকৃত সত্তা ও দায়িত্ব-কর্তব্যের বিষয় সম্যক বুঝিয়ে দেয়া। নবী-রসুলদের দ্বিতীয় কাজ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে গাইডেন্স বা নির্দেশনা মানুষের কাছে পৌছে দেয়া। তাঁদের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল, আল্লাহর কাছে মানুষের কৃত ওয়াদার প্রেক্ষিতে আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত গাইডেন্স বা হেদায়াতের ভিত্তিতে বাস্তব জীবনকে সুষ্ঠুরূপে গড়ে তোলার ট্রেনিং প্রদান। চতুর্থতঃ জীবন ও সমাজ বিনির্মাণের মৌলিক কাঠামো বা উপকরণাদি সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রসুলগণ দুনিয়ায় মানুষের জন্য যোগান দিয়ে গেছেন, যাতে আমরা দুনিয়ায় যথাযথভাবে আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন বা খেলাফতের হক আদায় করতে পারি।

যুগে যুগে প্রত্যেক এলাকায় আল্লাহতায়ালা নবী-রসুল প্রেরণ করেছেন। বিশেষ যুগ, গোত্র ও এলাকার চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যেই তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু আখেরী নবী হযরত মুহম্মদ (স) কে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন সমগ্র মানবজাতি ও কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সকল যুগের জন্য। পূর্ববর্তী সকল নবী-রসুলের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন ফরয, কিন্তু অনুসরণ করতে হবে একমাত্র আখেরী নবীকে (স) কেননা এটা আখেরী যুগ। এ যুগ যত দীর্ঘই হোক না কেন, এর নবী একজনই, একমাত্র তাঁর আনুগত্য করাই সকল মানুষের কর্তব্য।

পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাব নানাভাবে বিকৃত হয়েছে। তার মধ্যে কতটুকু আসল আর কতটুকু আরোপিত আজ তা উদ্ধার করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। অতএব তা মনসুক বা অনুসরণের অযোগ্য। আখেরী নবীর (স) মাধ্যমে নাযিলকৃত আসমানী কিতাব


www.pathagar.com

আল-কোরআনই এখন একমাত্র অনুসরণীয় নির্ভুল ঐশী কিতাব। এ মহাগ্রন্থ তথা আল্লাহর গাইডেন্সের ভিত্তিতে মহানবী এক আদর্শ জীবন ও সমাজ গঠন করে মানব জাতির জন্য এক অতুলনীয় ও চিরন্তন নিদর্শন স্থাপন করে গেছেন। এ মহাগ্রন্থ আল-কোরআন এবং মহানবীর সর্বোৎকৃষ্ট জীবনাদর্শ বা সুন্নাতে রসূলুল্লাহ্ই হলো শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি। মহানবী (স) ইবাদতের যে পদ্ধতি প্রদর্শন করেছেন, ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি একমাত্র সেটাই। সেটা থেকে এতটুকু বিচ্যুত হলে কিংবা কমবেশী করলে সেটা ইবাদত রূপে গণ্য হবে না। কারণ মহানবী (স) কে ইবাদতের পদ্ধতি শিখিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। অতএব তাঁকে অনুসরণ করলে বা তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য করলেই আমরা প্রকৃত কামিয়াবী হাসিল করতে সক্ষম হব।

আল্লাহতায়ালা দুনিয়ায় মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি দুনিয়ায় আমাদেরকে প্রেরণের পূর্বেই আমাদের নিকট থেকে (আযল অবস্থায়) আমাদের প্রতিপালকের আনুগত্য করার দৃঢ় শপথ নিয়েছিলেন। সে পবিত্র শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য যুগে যুগে তিনি নবী-রসুল প্রেরণ করেছেন। নবী-রসুলগণ সে শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার সাথে সাথে মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কেও নছিহত করেছেন এবং আল্লাহর দেয়া ঐশী কিতাব তথা আল্লাহর বিধান মোতাবেক জীবন পরিচালনা করে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের বাস্তব ট্রেনিং দিয়ে গেছেন। দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সর্বশেষ ঐশী কিতাব, মহাগ্রন্থ আল-কোরআন, এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল মুহম্মদ (স) এর সর্বোৎকৃষ্ট জীবনাদর্শ বা সুন্নাতে রসুলুল্লাহ (স) অক্ষত, জীবন্ত অবস্থায় আমাদেরকে সর্বদা আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দেয় ও তা সুষ্ঠুরূপে পালনে অনুপ্রেরণা যোগায়।

অতএব, খেলাফতের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে মানব জাতি অনবহিত নয়। এটা কীভাবে সুষ্ঠুরূপে পালন করতে হবে তার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন এবং গাইডলাইন হিসাবে মহাগ্রন্থ আল্-কোরআন ও সুন্নাহ্র মহান আদর্শও আমাদের সামনে বিদ্যমান। এর পরিপ্রেক্ষিতে যারা খেলাফতের দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে আন্জাম দিতে সক্ষম তারাই প্রকৃতপক্ষে কামিয়াব এবং তাদের জন্যই আল্লাহ ওয়াদা করেছেন মহা পুরস্কার, জান্নাতের চির শান্তিময় স্থান। আর এত সব কিছু সত্ত্বেও যারা খেলাফতের দায়িত্ব পালনে অবহেলা-অস্বীকার করবে আল্লাহর নাফরমান বান্দাহ হিসাবে তাদের স্থান নির্ধারিত হয়েছে কঠিন শাস্তিময় অনন্ত জাহান্নামে। এসব হতভাগ্য আদম-সন্তানের জন্যই আল্লাহতায়ালার সুস্পষ্ট ঘোষণাঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

অর্থাৎ "যারা কুফরী করে ও আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই অগ্নিবাসী-সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" (সুরা বাকারা, আয়াত-৩৯)।

আল্লাহ অন্যত্র আরো বলেনঃ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ -

অর্থাৎ "যারা কুফরী করে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন।" (সুরা ফাতির, আয়াত-৩৬)।



www.pathagar.com

উক্ত একই সূরার পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝

অর্থাৎ "সেখানে (জাহান্নামে) তারা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দাও, আমরা সৎকর্ম করব, পূর্বে যা করতাম তা করব না।' আল্লাহ বলবেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা ফাতির, আয়াত–৩৭)।

আল্লাহ পৃথিবীতে প্রেরণের পূর্বেই মানুষের নিকট থেকে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে এসে মানুষ সে প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যাবার পর তিনি সতর্ককারী (নবী–রসূল) পাঠিয়ে সে প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও অনেকেই তাতে কর্ণপাত করে না। তারা পরকালে আফসোস্ করবে, আবার পুনর্জন্ম লাভের জন্য আবেদন জানাবে, যাতে তারা সৎকর্ম করার সুযোগ পায়। কিন্তু তাদের সে আফসোস্ এবং আবেদনে কোনই কাজ হবে না। আল্লাহ তাদের দুনিয়ার আমল হিসাবে যথাযথ কর্মফল দেবেন, অর্থাৎ জাহান্নামের প্রজ্বলন্ত অগ্নিতে তাদের নিক্ষেপ করা হবে। সেই কঠিন শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে মানুষকে অবশ্যই দুনিয়ায় খেলাফতের দায়িত্ব পালনে তৎপর হতে হবে, কুফরী কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বার বার মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেনঃ

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۔

অর্থাৎ "তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং কেউ কুফরী করলে তার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফিরদের কুফরী কেবল তাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" (সূরা ফাতির,আয়াত–৩৯)।

অতএব, আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি মনোনীত করে যে বিরাট মর্যাদা দান করেছেন, তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য যথাযথ উপলব্ধি করা একান্ত আবশ্যক। দুনিয়ার জিন্দিগীতে সময় থাকতে যদি আমরা তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই এবং প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব–কর্তব্য সম্পাদনে গাফেল হই, তাহলে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্র খলিফা হিসাবে যে বিরাট মর্যাদা আমাদের প্রাপ্য–সেটা থেকেই আমরা শুধু বঞ্চিত হব তা নয়; আখিরাতের জীবনেও চরম জিল্লতি ভোগ করতে হবে। সেই দুঃসহ পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।



www.pathagar.com

# পঞ্চম অধ্যায়

## ইবাদতের মূলভিত্তি

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আশা করি এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহতায়ালা মানুষকে একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন এবং মহান স্রষ্টার আদেশ-নির্দেশ মুতাবিক সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করলেই দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করা হয়। এ দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে পালনের উদ্দেশ্যে ইসলাম ইবাদতকে পাঁচটি মূলভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছে। এগুলো হলোঃ

এক) কালেমা (দুই) নামায (তিন) রোযা (চার) হজ্ব ও (পাঁচ) যাকাত

অবশ্য মূলভিত্তিই সমগ্র ইসলাম নয়। ইসলাম রূপ সুবিশাল ইমারত এ পাঁচটি স্তম্ভের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু স্তম্ভকেই যেমন কেউ গৃহ মনে করে না, আবার তেমনি মজবুত স্তম্ভ ছাড়া কোন গৃহের কথা কল্পনাও করা যায় না। এ সম্পর্কে দুটি বিখ্যাত হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া যায়ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ ইসলাম পাঁচটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল। তা হলোঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহম্মদ (স) আল্লাহ্র রসুল-এ কথার সাক্ষ্য দান, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, আল্লাহর ঘরের হজ্ব করা এবং রমযান মাসের রোযা রাখা।"-বুখারী ও মুসলিম।

মহানবী (স) এর অপর একটি হাদীসে ব্যাখ্যাসহ এ পাঁচটি মূলভিত্তির উল্লেখ আছেঃ

"দ্বীন ইসলামের পাঁচটি কাজ এমন যে, এর একটি ছাড়া অন্যগুলো আল্লাহতায়ালা কবুল করে না। তা হলোঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুহম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও রসুল, আল্লাহ তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব, জান্নাত ও জাহান্নাম, মৃত্যু-পরবর্তী জীবন-এ সব কটির প্রতি বিশ্বাসের সাক্ষ্য দান। এটা পাঁচটির একটি আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায হলো দ্বীন ইসলামের খুঁটি। আল্লাহ নামায না পড়লে তার ঈমান কবুল করবেন না। যাকাত হলো গুনাহ্ থেকে পবিত্রতা লাভের উপায়, আল্লাহ ঈমান ও নামায কবুল করবেন না যাকাত আদায় না করলে (অবশ্য) যার উপর যাকাত ফরয তার ব্যাপারেই একথা প্রযোজ্য)। যে লোক এ তিনটি করল, কিন্তু রমযান মাস এলে সে ইচ্ছা করেই রোযা তরক করল, আল্লাহ তার ঈমান, নামায ও যাকাত কবুল করবেন না। যে লোক এ চারটি কাজ করলো, পরে হজ্ব করা তার পক্ষে সহজ হলেও তা করল না, সেজন্য কাউকে অছিয়ত করেও গেল না এবং তার বংশের কোন লোকও তার পক্ষ থেকে হজ্ব করল না, আল্লাহ্ তার পূর্বোদ্ধৃত চারটি কাজ কবুল করবেন না।"



www.pathagar.com

কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে শেষোক্ত দীর্ঘ বাণীটি কোন হাদীস নয়, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত প্রথমোক্ত হাদীসেরই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা। অতএব, এটাকে ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করলেও এ ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে ইসলামের মৌল ভাবধারা ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। (দ্রষ্টব্যঃ মওলানা মুহম্মদ আব্দুর রহীম/ হাদীস শরীফ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা–১০৮)।

উপরোক্ত হাদীস এবং এর ব্যাখ্যা থেকে এটা সুস্পষ্ট হলো যে, ইসলামের পাঁচটি মূলভিত্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর একটির সাথে অন্যটির মৌল সম্পর্ক বিদ্যমান। এর কোন একটিকে বাদ দিয়ে অপরগুলো অনুসরণ করা যায় না বা তাতে উদ্দীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয় না। অতএব, ইসলামের এ বুনিয়াদী পাঁচটি বিষয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য যেমন গভীরভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন তেমনি তা অনুসরণের ক্ষেত্রেও একান্ত নিষ্ঠাবান হওয়া কর্তব্য। আর এ বুনিয়াদী বিষয়গুলো এমনই যে, এগুলো অনুসরণ করলে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের মধ্যেই দাখিল হওয়া যায়। এগুলো হলো সোপান তুল্য, যা ধাপে ধাপে ইসলামের সামগ্রিকতার মধ্যে আমাদেরকে অগ্রসর করে দেয়। সিঁড়ির একটি ধাপ বিনষ্ট হলে, পুরো সিঁড়িটাই যেমন অকেজো হয়ে পড়ে, তেমনি ইসলামের এ পাঁচটি মূল ভিত্তির প্রত্যেকটিই এমন গুরুত্বপূর্ণ বা অপরিহার্য যে, এর কোন একটিকে বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের মধ্যে দাখিল হওয়া যায় না বা সত্যিকার মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়।

এবারে একে একে এ পাঁচটি মূল ভিত্তি বা রুকন সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব।

**কলেমা**

ইবাদতের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো কলেমা। কলেমায় বিশ্বাস স্থাপন ফরয। কলেমায় বিশ্বাস স্থাপন না করে অন্য যত ইবাদতই করা হোক না কেন, তার কোনই ফল আখিরাতে পাওয়া যাবে না। কলেমায় বিশ্বাস বা ঈমান আনাকে ঝুড়ির মজবুত তলার সাথে তুলনাযোগ্য। ঝুড়ির তলা না থাকলে বা তলা মজবুত না হলে তাতে যত সামগ্রীই রাখা হোক না কেন, তার কোনই হদীস পাওয়া যায় না। কলেমাও ঠিক তেমনি, আমাদের সকল ইবাদত বা শুভ কর্মের যথাযোগ্য প্রতিফল পাওয়ার জন্য কলেমার প্রতি ঈমান আনা একান্ত অপরিহার্য।

কলেমা মূলতঃ একটি বিপ্লবী ঘোষণা। মুখ দিয়ে এ ঘোষণা উচ্চারণের সাথে সাথে যে কোন মানুষ মুসলমান হিসাবে গণ্য হয়। আর এ ঘোষণার মর্মবাণীকে যখন কেউ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে জীবনের সামগ্রিক কর্মকান্ডে, চিন্তা–চৈতন্যে তার প্রকাশ ও প্রতিফলন ঘটায় তখন তাকে বলা হয় মুমীন। কলেমার এ বিপ্লবী ঘোষণা আবহমান কাল থেকে মানুষকে সত্য–মিথ্যা, ভাল–মন্দ, কল্যাণ–অকল্যাণ, আলো–অন্ধকার, শান্তি–অশান্তি এর মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ ও তার ফলশ্রুতি নির্মাণে সাহায্য করেছে। আল্লাহ বলেনঃ

"ইন্নাল্লাজিনা আমানু ওয়া আমিলুস্সালিহাতি লাহুম আজরুন গায়রু মামনুন।"

অর্থাৎ "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।" – (সুরা হা'মীম, আস সিজদাহ আয়াত–৮।)

সুতরাং শুধু ঈমান আনলেই চলবে না। ঈমানের দাবী অনুযায়ী সৎকর্ম করতে হবে।



www.pathagar.com

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'–অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্যকোন ইলাহ্ বা প্রভু নেই। এ ঘোষণার দ্বারা সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত কলেমায় বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ বা ঈমানদারগণ জীবন ও সমাজের তথা আসমান–যমীনের সকল মিথ্যা খোদায়ী দাবীকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, বিশ্ব–জগতের একমাত্র স্রষ্টা বা আসল খোদার প্রতি ঈমান এনে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছে। একদিকে মুখে এ ঘোষণা উচ্চারণ করে, অন্যদিকে জীবনের সকল পর্যায়ে অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে যখন কলেমার দাবী অনুযায়ী কাজ করা হয় তখনই সে হয় সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তি। আর যদি কেউ মুখে কলেমা উচ্চারণ করা সত্ত্বেও বাস্তব জীবন–যাপনের ক্ষেত্রে কলেমার দাবী পূরণ না করে মানুষের মনগড়া–আদর্শ ও চিন্তা–চেতনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে তাহলে তাকে মুনাফিক ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। শুধু মুখে কলেমা উচ্চারণের দ্বারা বাস্তব জীবনে কোন শুভ ফল বা কল্যাণ লাভের প্রত্যাশা করা যেতে পারে না। এটাকে একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝানো যেতে পারে।

কোন অসুস্থ ব্যক্তি তার রোগ–নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ডাক্তারের কাছে গিয়ে প্রেসক্রিপশান নিয়ে সে প্রেসক্রিপশন মোতাবেক যথানিয়মে ঔষধ–পথ্য সেবন করলেই তার রোগ–নিরাময় আশা করতে পারে। কিন্তু প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী যথাবিধি ঔষধ–পথ্য ব্যবহার না করে শুধু প্রেসক্রিপশন বার বার পড়লে বা যত্ন করে রেখে দিলে, এমনকি তাবিজ বানিয়ে তা গলায় ঝুলিয়ে রাখলেও কোন ফল হবে না। কলেমার ব্যাপারও ঠিক তাই। যদি তা শুধু উচ্চারণ করা হয়, আর বাস্তব জীবনে তার হক আদায় করা না হয়, তাহলেও প্রত্যাশিত ফল আশা করা বাতুলতা মাত্র। উপরন্তু বাস্তব জীবনে যদি কলেমার দাবী পূরণ না করে বরং তার বিপরীত চিন্তা–চেতনা, আদর্শ দ্বারা জীবন পরিচালনা করা হয়, তাহলে সেটা হবে আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং তার দ্বারা কোন কল্যাণ তো নয়ই বরং ইহ–পরকালে চরম অল্যাণ ও শাস্তিই হবে অনিবার্য প্রাপ্য। সত্যের অনুসরণেই কল্যাণ, শান্তি ও সাফল্য, মিথ্যার অনুসরণে অকল্যাণ, অশান্তি ও ব্যর্থতার নির্মম পরিণতি।

কলেমার দাবী হলো, কলেমায় উচ্চারিত ঘোষণা অনুযায়ী জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব মেনে নিয়ে বিশ্বাস ও আমলের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা–অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক তথা সামগ্রিক জীবনায়নে একমাত্র আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী চলাই কলেমার দাবী। তাই দেখা যায়, মাত্র তিনটি শব্দ–'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'–আবহমান কাল থেকে দুনিয়ায় হক বাতিল, ন্যায়–অন্যায়, কল্যাণ–অকল্যাণ ও জীবনের সাফল্য–ব্যর্থতার মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করেছে। কলেমার মর্মবাণী উপলব্ধি না করে যারা শুধু মন্ত্রপাঠের মত এ মহা তাৎপর্যপূর্ণ পবিত্র বাণী উচ্চারণ করে থাকে, তারা আদম শুমারীর হিসাবে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হলেও মোমেনের গুণাবলী থেকে বঞ্চিত। কলেমার দাবী পূরণ না করে শুধু মুখে উচ্চারণের দ্বারা বাস্তবে কোন ফায়দা হাসিল হয় না, কলেমা তাদের জীবনে ঈপ্সিত পরিবর্তন এনে দেয় না। অর্থাৎ কলেমা পাঠের পরও যার জীবনে ঈপ্সিত পরিবর্তন সূচিত হয়নি, বুঝতে হবে কলেমার সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধিতে সে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এরূপ কলেমা পাঠ নিরর্থক। কলেমা পাঠের পরও যদি কেউ জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অমুসলমানদের মত চলে, তাহলে



www.pathagar.com

অমুসলমানদের সাথে তার পার্থক্য কোথায়? তাই বর্তমান মুসলিম সমাজের এটা এক বড় ব্যাধি যে, আমরা গতানুগতিকভাবে মুখে কলেমা উচ্চারণ করে নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে থাকি এবং এ মুসলমানত্বের দাবীতেই সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিশেষ রহমত, অনুকম্পা ও নিয়ামত প্রত্যাশা করি। অথচ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র হুকুম ও বিধান মুতাবিক চলার চেষ্টা করি না, হয়ত তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করি না–বহু ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম ও বিধানের বিপরীত কাজগুলোই করে থাকি। ফলে একজন কাফের এবং বেদ্বীনের সাথে আমাদের কোন পার্থক্য চোখে পড়ে না। অথচ শুধু কলেমা উচ্চারণের ফলে আমরা আল্লাহতালার বিশেষ অনুকম্পার প্রত্যাশী হলে সেটাকে অর্থহীন বাতুলতা ছাড়া আর কী বলা যায়? অতএব, মুসলিম সমাজের ব্যাধি তালাশ করতে হলে মুসলমানদের উচ্চারিত ঈমানের ঘোষণা এবং তাদের আচরিত বাস্তব জীবনের আসমান–যমীন বৈসাদৃশ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। সঠিকভাবে এ রোগ নিরূপণ ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হলে নিঃসন্দেহে মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে অবারিত কল্যাণ, শান্তি, সাফল্য ও রহমতের ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে।

কলেমার বিপ্লবী আহবান শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সমগ্র সমাজ তথা পৃথিবীতে যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত করে তার সুস্পষ্ট উদাহরণ হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে মানবেতিহাসের সর্বস্তরেই বিদ্যমান। এটা হলো ত্যাগ ও সংগ্রামের অত্যুজ্জ্বল ইতিহাস। বাতিলের সাথে হক, অন্যায়ের সাথে ন্যায়, মিথ্যার সাথে সত্যের এ চিরন্তন সংগ্রাম আদি থেকে অনন্ত কাল পর্যন্ত চলে আসছে। প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক নবী–রসূলের জীবনই ছিল এ সংগ্রামের অত্যুজ্জ্বল কাহিনীতে পূর্ণ। আখেরী নবী, আম্বিয়াকুল শিরোমনি, সরওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহম্মদ (স) এর জীবনেতিহাসে এ সংগ্রামের উদ্দীপনাময় কাহিনী জীবন্ত অনুপ্রেরণা হিসাবে সর্বদা মানবজাতিকে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করে। কলেমার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে, মহানবী (স) এর নেতৃত্বে মুষ্টিমেয় দরিদ্র, সহায়সম্বলহীন, জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত, কলেমার ঝান্ডাধারী কতিপয় মুসলমান তৎকালীন সমাজে বিরাজমান জাহেলিয়াতের অন্ধকাররাশি বিদূরিত করে বাতেল সমাজের গর্বোন্নত, জালেম ও মিথ্যার ধ্বজাধারী আধিপত্যবাদীদের দর্প ও অহংকার চূর্ণ–বিচূর্ণ করে দুনিয়ায় আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলেমার আসল দাবী ও তাৎপর্য এটাই। কলেমা এমন একটি আলো, যা কেবল একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠের তমসাই বিদূরিত করে না–সহস্র প্রকোষ্ঠের অন্ধকাররাশি বিদূরিত করে ঐশী আলোর হিরোন্ময় জ্যোতিতে দিগন্ত উদ্ভাসিত করে তোলে। সে আলো ছড়িয়ে পড়ে সীমা–সংখ্যাহীন মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করে আদিগন্ত পৃথিবীর সুবিস্তীর্ণ বুকে।

কলেমার দ্বিতীয় অংশ হলো–'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (স) হলেন আল্লাহর রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ। আল্লাহতায়ালা এ মহামানবের মাধ্যমেই আখেরী যুগের সমগ্র মানবজাতির জন্য তাঁর বিধান পৃথিবীতে নাযিল করেছেন, অন্যদিকে, দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ এ মহামানব নিজের জীবনের প্রতিটি কাজ, আচরণ,কথা ও আখলাকের মধ্যে আল্লাহর দ্বীনকে পুরাপুরি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শুধু সমকালীন নয় সর্বযুগের মানুষের জন্য সর্বোন্নত আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। অতএব, তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যেমন ফরয,



www.pathagar.com

তাঁকে অনুসরণ করাও তেমনি অপরিহার্য। তিনিই একমাত্র আদর্শ, যাঁকে অনুসরণ করে যুগে যুগে মানুষ শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। আজো অশান্তির দাবানলে দগ্ধীভূত, সংঘাতপূর্ণ এ পৃথিবীতে শান্তির আবেহায়াত, কল্যাণ ও সাফল্যের কাংক্ষিত সম্ভাবনাকে অনিবার্য করে তুলতে হলে একমাত্র তাঁর প্রদর্শিত সরল পথই অবলম্বনীয়। মহান স্রষ্টা তাঁর প্রিয় হাবীব সম্পর্কে বলেনঃ

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

অর্থাৎ "মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তিনি পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ তাঁর রাসুল প্রেরণ করেছেন।" (সুরা তাওবা, আয়াত–৩৩)।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এটা স্পষ্ট হলো যে, দুনিয়ার অন্য সমস্ত মত, পথ ও আদর্শের উপর আল্লাহর দ্বীনকে সর্বতোভাবে বিজয়ী করার জন্যই আল্লাহ ইসলাম ধর্ম মানুষের জন্য মনোনীত করেছেন। দ্বিতীয়তঃ দ্বীন ইসলাম হলো স্বয়ং আল্লাহর সঠিক পথ–নির্দেশ ও সত্য জীবন–বিধানের সমষ্টি। তৃতীয়তঃ নবী–রসুলগণ কেবলমাত্র আলাহর দ্বীনের প্রবর্তক, তাঁরা এটার স্রষ্টা নন, দ্বীনের স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ। নবী–রসুলগণকে আল্লাহ বিশেষভাবে তাঁর দ্বীনের প্রচার ও প্রবর্তনের জন্য বিশেষ যোগ্যতা, জ্ঞান ও ট্রেনিং দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। আখেরী নবীও এর ব্যতিক্রম নন; বরং নবীদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্টতম। আল্লাহ তাঁর মধ্যে সর্বোত্তম মানবীয় গুণের সমাবেশ করেছেন। মহানবীর (স) এ মর্যাদা সম্পর্কে বহুসংখ্যক আয়াতের মধ্যে এখানে মাত্র দুটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۝

অর্থাৎ "আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।" (সুরা সাবা, আয়াত–২৮)।

আল্লাহ অন্যত্র বলেনঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ

اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۔

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সুরা আহযাব, আয়াত–২১)।

মহানবী (স) সমগ্র মানবজাতির জন্য রাসুল হিসাবে প্রেরিত, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর পূর্বেকার সকল আম্বিয়াকেরাম ছিলেন বিশেষ যুগ, এলাকা ও গোত্রের জন্য দায়িত্ব পালনকারী নবী বা রাসুল। কিন্তু মহানবী (স) এধরনের সীমাবদ্ধতার উর্ধে, তিনি সর্বকাল, গোত্র–বর্ণ–অঞ্চল নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির জন্য রাসুল হিসাবে প্রেরিত। আল্লাহ তাঁকে মানবীয় সকল সৎগুণাবলীসহ সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তিনি শুধু আল্লাহর দ্বীন প্রচারই করেননি, নিজের জীবনে তা পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেছেন এবং



www.pathagar.com

অন্যদেরকেও প্রশিক্ষণ দিয়ে আদর্শ মানুষ ও আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার সর্বোকৃষ্ট নিদর্শন স্থাপন করে গেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

অর্থাৎ "তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করে আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন, তিনি (রাসুল) তাঁর (আল্লাহর) আয়াত তাদের (মুমিনদের) নিকট আবৃত্তি করে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে (বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে) এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তারা আগে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।" (সুরা আলে ইমরান,আয়াত–১৬৪)।

মহানবী (স) বাস্তব জীবনে আল্লাহর দ্বীনকে পূর্ণরূপে অনুসরণ না করে যদি শুধু থিওরীটেক্যালী (তত্ত্বগতভাবে) আল্লাহর দ্বীন প্রচার করতেন, তাহলে মানবজাতি সেটা কতটা গ্রহণ করতো তা প্রশ্নসাপেক্ষ। উপরন্তু, যদি শুধু নিজে অনুসরণ করতেন, অন্যদেরকে সে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ না করতেন, তাহলেও ইসলাম কতটা বাস্তবায়িত হতো সে ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, তিনি দ্বীনকে নিজে পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করেছেন এবং দ্বীনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় তাঁর অনুসারীদেরকে শিক্ষা দিয়ে তাঁদেরকেও সর্বোত্তম মানুষে পরিণত করেছেন। সেজন্যই তাঁকে বলা হয় জীবন্ত কোরআন আর তাঁর নিকট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অসভ্য, বর্বর, নিকৃষ্ট শ্রেণীর আরব বেদুঈন সম্প্রদায় সর্বোত্তম মানব–সম্প্রদায়ে উন্নীত হয়েছিল। তাঁর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়েই খোলাফায়ে রাশেদীন তথা সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর দ্বীনকে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। মহানবী (স) এবং তাঁর নিকট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব জীবনাদর্শ আজো তথা সর্বকালের মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণার মহত্তম উৎস। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন মহাপুরুষ নেই যাঁর জীবনের সমস্ত কথা, কাজ, আচরণ ও খুঁটিনাটি বিষয় স্পষ্ট দর্পণের ন্যায় সংরক্ষিত আছে। এমন কোন মহৎ ব্যক্তির পরিচয় জানা যায় না যাঁর বাস্তব জীবনাদর্শ সর্বক্ষেত্রে উন্নত ও অনুসরণীয়। এমন কোন মহাপুরুষের পরিচয় জানা যায় না, যাঁর মহৎ চরিতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এত অধিক সংখ্যক ব্যক্তি উন্নত মানবীয় গুণে গুণান্বিত হয়ে বিশ্বে এক আদর্শ মানব সমাজ গড়ে তুলেছে এবং সর্বকালের মানুষের জন্য সেটাকে এক মহত্তম অনুপ্রেরণার উৎসে পরিণত করে গেছে। মানব জাতির ইতিহাসে মহানবী (স) এ সকল ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম এবং সর্বাংশে সমুজ্জ্বল সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব। তাই তাঁকে বলা হয় 'রহমাতুল্লিল আলামীন'–অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত স্বরূপ। তাঁকে অনুসরণ করলেই প্রকৃত মানুষ ও মুমিন হওয়া যায়, মানব জীবনের চরম সাফল্য অর্জন একমাত্র সে পথেই সম্ভব। আর তাঁকে অনুসরণ করার অর্থই আল্লাহর আনুগত্য করা। এসম্পর্কে আল্লাহ



www.pathagar.com

বলেনঃ 'আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসূল' – অর্থাৎ 'রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমেই আল্লাহর আনুগত্য করা হয়।' আর আল্লাহর আনুগত্যই প্রকৃত ইবাদত। অতএব, কলেমার প্রথম অংশ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, দ্বিতীয় অংশও তেমনি। মূলতঃ দুটি অংশই এক অবিভাজ্য বিশ্বাসের উজ্জ্বল হীরকখন্ড। এ অবিভাজ্য কলেমার উপর পূর্ণ ঈমান আনা ফরয।

ঈমানদারদের কয়েকটি মৌলিক গুণ সম্পর্কে আল্লাহপাক কোরআন শরীফের শুরুতেই উল্লেখ করেছেনঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا
أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ـ أُولٰئِكَ
عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

অর্থাৎ "এটা সেই কিতাব (আল-কোরআন); এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটা পথ-নির্দেশ, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে ও তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং তোমার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরকালে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, তারাই তাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।" (সুরা বাকারা, আয়াত-২-৫)।

এখানে মুমিনের গুণ ও পরিচয় বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন তার প্রত্যেকটি এত গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে যে এর ব্যাখ্যা করতে গেলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। মুমিন ও ইসলামের ব্যাপক পরিচয়কে এখানে মাত্র কয়েকটি বাক্যে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, তা যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার করে। মুমিনের এ গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ

**এক**) সংশয়-সন্দেহহীনভাবে তারা মহাগ্রন্থ আল্-কোরআনকে তাদের জীবন-পথের সুস্পষ্ট নির্দেশ বা গাইডলাইন হিসাবে মেনে নেয়,

**দুই**) তারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে;

**তিন**) সালাত কায়েম করে;

**চার**) আল্লাহ তাদেরকে যে সমস্ত জীবনোপকরণ দান করেছেন, তা থেকে ব্যয় করে,

**পাঁচ**) মহানবী (স) ও তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবী-রসূলদের উপর ঈমান আনয়ন এবং মহানবী (স) ও অন্যান্য সকল নবী-রসূলদের উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, সে সকল কিছুর উপর ঈমান আনয়ন,

**ছয়**) তারা পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাসী,

**সাত**) উপরোক্ত বিষয়গুলোর উপর দৃঢ় ঈমান এনে যারা চলছে, তারাই আল্লাহ-নির্দেশিত পথে রয়েছে বা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে চলছে। তাদের জন্য রয়েছে


www.pathagar.com

সফলতা (দুনিয়া ও আখিরাতে)।

মুমিনের এসব গুণ- বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। এখানে অতি সংক্ষেপে মাত্র সামান্য কিছুটা আলোকপাত করার প্রয়াস পাব। প্রথমতঃ 'মু'মিন' শব্দের অর্থ জানা দরকার। 'মু'মিন' শব্দের অর্থ ঈমানদার-বিশ্বাসী। আল্লাহর উপরে যে দৃঢ়ভাবে ঈমান এনে, ঈমানের দাবী অনুযায়ী স্বীয় জীবন পরিচালনা করে সেই মু'মিন। মু'মিনের অন্য অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তাদানকারী। আল্লাহ্‌র উপর যে দৃঢ় আস্থা এনে জীবন পরিচালনা করে আল্লাহ তার মনে ইত্‌মিনান বা শান্তি পয়দা করেন, তার দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তার দায়িত্বও নিয়ে নেন। অন্যদিকে, আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি এবং সেই সাথে ঈমানের দাবী অনুযায়ী যে চলে, তার দ্বারা কোনরূপ অন্যায়, অশান্তি ও জুলুম-নির্যাতনের কাজ সংঘটিত হতে পারে না। সে ব্যক্তি সমাজের অন্যান্য মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টর (নিশ্চয়তাদানকারী) হয়ে যায়। যদি কেউ ঈমান আনার দাবী করে, অথচ উল্লিখিত গুণাবলী তার মধ্যে পরিলক্ষিত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে মৌখিকভাবে সে ঈমানের দাবী করলেও ঈমানের দাবী অনুযায়ী সে নিজেকে পরিচালিত করে নাই-অর্থাৎ সে মু'মিন হতে পারে নাই।

মু'মিন ও মুত্তাকীর সাথে এক মৌলিক সাদৃশ্য বিদ্যমান। মুত্তাকীর সাধারণ অর্থ পরহেজগার, খোদাভীরু। এর আভিধানিক অর্থ সাবধানতা অবলম্বন। অর্থাৎ সকল চিন্তা, কাজ ও আচরণে আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহ-নির্দেশিত হুকুম-নিষেধ, হালাল-হারামের সীমারেখা সতর্কভাবে মেনে চলাই মুত্তাকীর পরিচয়। অতএব, মুত্তাকী হওয়ার জন্য ঈমানদার হওয়া অপরিহার্য। মজবুত ঈমান ছাড়া কেউ মুত্তাকী হতে পারে না। সত্যিকারের ঈমানদার ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা, আমল-আখলাকই জন্ম দেয় তাক্‌ওয়ার আর তাক্‌ওয়াসম্পন্ন ব্যক্তিই হলো মুত্তাকী। আল্লাহ বলেন, এধরনের লোকেরা আল্-কোরআন থেকেই তাদের জীবনের সকল পথ-নির্দেশ গ্রহণ করে থাকে। দ্বিতীয়তঃ তারা গায়েব অর্থাৎ অদৃশ্যে বিশ্বাস করে। আল্লাহ নিরাকার, অনন্ত অসীম। তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা কখনো সম্ভব নয়। অতএব, আল্লাহকে না দেখেই বিশ্বাস করতে হবে। এ ছাড়া, তকদীর, ফেরেশতা, আখিরাত, বেহেশত-দোযখ ইত্যাদিও না দেখে বিশ্বাস করতে হবে। তৃতীয়তঃ সালাত বা নামায কায়েম করার অর্থ নামাযের জন্য বাহ্যিক প্রস্তুতি গ্রহণ ছাড়াও মনের পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে নামায পড়া, পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও সমাজের সবাইকে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া, নামায পড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং সর্বোপরি নামাযকে জীবন ও সমাজের অপরিহার্য পালনীয় বিধানে পরিণত করাকেই নামায কায়েম করা বলে। চতুর্থতঃ আল্লাহর দেয়া জীবনোপকরণ থেকে ব্যয় করা। এখানে 'ব্যয় করা' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলাম সকল প্রকার অপব্যয়কে নিষিদ্ধ করেছে, কিন্তু সংগত ব্যয়কে উৎসাহিত করেছে। কৃপণতা ও মাল- সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত লোভ ও আকর্ষণকে বর্জন করতে বলেছে।

এখানে ব্যয় বলতে প্রথমতঃ নিজের জন্য,পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয়। সম্পদের আসক্তি অনেক সময় মানুষকে তার নিজের এবং পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা থেকেও নিবৃত্ত রাখে। কিন্তু নিজের নফসের যেমন একটা হক আছে, পরিবারের


www.pathagar.com

লোকদেরও তেমনি একটি হক আছে, এ হক পূরণ করা অবশ্য কর্তব্য। এটা আল্লাহর নির্দেশ পালনের শামিল, অতএব এর মধ্যে ছওয়াব নিহিত। এছাড়া গরীব-অভাবী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও সমাজের অভাবগ্রস্ত যে কোন ব্যক্তির জন্য ব্যয় করার নির্দেশও উল্লিখিত আয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এজন্য ইসলাম যাকাত, ফেৎরা, সাদকা বা সর্বপ্রকার দান-খয়রাতের ব্যবস্থা রেখেছে। এর কোনটা ফরয, কোনটা নফল (ঐচ্ছিক)। ফরয তো অবশ্য পালনীয়, ঐচ্ছিকভাবে সামর্থ অনুযায়ী যে যত বেশী দান-খয়রাত করবে তার মধ্যেই তার পরীক্ষা ও প্রতিদান নির্ধারিত হবে। তবে মনে রাখতে হবে, কোন ধরনের ব্যয়ই যেন অপব্যয় এবং লোক-দেখানোর পর্যায়ে না পড়ে, একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তেই যেন তা হয়। তাহলেই সেটা হবে ইবাদত।

**পঞ্চমতঃ** মু'মিন বা মুত্তাকী ব্যক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আখেরী নবী এবং পূর্ববর্তী সকল নবী-রসুলের উপর অবতীর্ণ সকল কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একটি বুনিয়াদী বিশ্বাস। মূলতঃ এ বিশ্বাস ছাড়া মুসলমান হওয়া যায় না এবং উদ্দিষ্ট কল্যাণ ও সাফল্যের পথে চলাও সম্ভব নয়। এছাড়া পূর্ববর্তী সকল নবী এবং তাঁদের উপর অবতীর্ণ সকল বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলে অন্যান্য আহলেকিতাবপন্থীদের সাথে ঐতিহাসিক বিরোধ নিষ্পত্তির ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী সকল নবী-রসুলদের মানা এবং তাঁদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এক জিনিস আর তাঁদেরকে অনুসরণ করা ভিন্ন জিনিস। আখেরী যমানার নবী হিসাবে আমাদেরকে অবশ্যই একমাত্র মহানবী (স) কেই অনুসরণ করতে হবে। অনুরূপভাবে, পূর্ববর্তী নবী-রসুলদের উপর অবতীর্ণ ওহী বা কিতাবাদি স্ব স্ব যুগের জন্য প্রযোজ্য ছিল। সেগুলো বর্তমানে আসল রূপে যেমন বিদ্যমান নেই তেমনি এযুগে তা অনুসরণ করারও প্রয়োজন নেই। আখেরী যুগে, মহানবী (স) এর মাধ্যমে আল্ কোরআনকেই একমাত্র অনুসরণীয় ঐশী কিতাব হিসাবে আল্লাহ নাযিল করেছেন।

**ষষ্ঠতঃ** পরকালের প্রতি দৃঢ় ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। এটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী ব্যক্তিরা দুনিয়ায় যা খুশী তাই করতে পারে। কিন্তু পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ কখনো, কোন অবস্থায় কোনরূপ অন্যায় ও অসঙ্গত কাজ, আচরণ, এমনকি তা করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। এ সদা-সতর্ক নৈতিক চেতনাই মানুষকে সৎ ও কল্যাণ ব্রতে উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া, দুনিয়ায় ভাল-মন্দ কাজের পরিপ্রেক্ষিতে আখিরাতে উপযুক্ত প্রতিদান দেয়ার ব্যবস্থা না থাকলে মানব জাতি সৃষ্টির কোন তাৎপর্যই থাকে না। অতএব, আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন এবং সেখানে শুভ প্রতিফলের প্রত্যাশা রাখা মু'মিনের জন্য অপরিহার্য।

সপ্তমতঃ বলা হয়েছে, উপরোক্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিরাই সমগ্রিকভাবে আল্লাহ-নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং প্রকৃত সফলকাম। মূলতঃ এ ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিদের পদস্খলন বা বিপদগামী হওয়ার কোন উপায়ই নেই অতএব, তাঁরা যে সফলকাম তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

উপরোক্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলোর বিষয় সামনে রেখে আমাদের প্রত্যেকেরই আত্মজিজ্ঞাসা



www.pathagar.com

করা দরকার যে আমরা কতটা ঈমানদার বা মু'মিন। এর কোন একটি গুণ-বৈশিষ্ট্যেরও অভাব নিজের মধ্যে অনুভূত হলে, অবিলম্বে তওবা করে আল্লাহর কাছে তা পাওয়ার জন্য দোয়া করা এবং সেজন্য যথোপযুক্ত প্রচেষ্টা চালানো আমাদের কর্তব্য। মনে রাখতে হবে; উপরোক্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলো মু'মিনের জন্য ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন। মূলতঃ আল্লাহর বিধান তথা আল্-কোরআন ও আল্-সুন্নাহর অনুসরণে সামগ্রিক জীবন পরিচালনাই মু'মিন-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং সাফল্যের চাবিকাঠি। তবে উপরোক্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জিত হলে যে কোন মানুষ ধীরে ধীরে এ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও নিশ্চিত সাফল্যের পথে অগ্রসর হবে তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

## নামায

ইসলামের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো নামায। অনেকের মতে, সর্বোত্তম ইবাদত হলো নামায। আল্লাহতায়ালা বলেনঃ

إِنَّنِيْ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَ أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ـ

অর্থাৎ "আমিই আল্লাহ,আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত (নামায) কায়েম কর।" (সুরা তাহা, আয়াত-১৪)।

উপরোক্ত আয়াতে করীমে আল্লাহ প্রথমতঃ স্বীয় পরিচয় প্রদান করে বলেছেন, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ বা উপাস্য নেই-মানুষের ইবাদত-বন্দেগী পাবার উপযুক্ত আর কেউ নেই। অতএব, বান্দাহ্র উচিত আল্লাহর ইবাদত করা এবং আল্লাহর স্মরণার্থে নামায কায়েম করা। এখানে বিশেষভাবে আল্লাহর স্মরণার্থে নামায কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচবার নামাযে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। প্রত্যহ এত বার আল্লাহকে যথার্থভাবে স্মরণ করলে কারো পক্ষে বিপদগামী হওয়া সম্ভব নয়।

সুরা হজ্বের ৭৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا

وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকু কর, সিজ্দা কর (অর্থাৎ নামায) এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর যাতে সফলকাম হতে পার।"

এখানে জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য তিনটি শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমতঃ নামায কায়েম করা, দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর ইবাদত করা এবং তৃতীয়তঃ সৎকর্ম করা। মূলতঃ এ তিনটির মধ্যে পারস্পরিক মৌলিক সম্পর্ক বিদ্যমান। যে ব্যক্তি নামায কায়েম করেছে সে অবশ্যই অন্যান্য সকল ইবাদতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছে এবং অসৎ কর্ম থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করে সৎকর্মে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েছে।

অন্য আর একটি আয়াতে আছেঃ

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى

عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ۝


www.pathagar.com

অর্থাৎ "তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর এবং সালাত কায়েম কর। সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে। আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।" (সূরা আনকাবুত, আয়াত–৪৫)।

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, নামাযে কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা, আল্লাহর স্মরণের জন্য আল্লাহর কিতাব পাঠই তো সর্বোত্তম। নামায আমরা কীভাবে আদায় করি এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণে কতটা মনোযোগী, আল্লাহ্ অবশ্যই তা প্রত্যক্ষ করেন। অতএব, নামায আদায়ে আমাদেরকে অবশ্যই নিষ্ঠাবান হওয়া প্রয়োজন। এখানে আশরাফুল মখলুকাতের গুণাবলী অর্জনে অর্থাৎ চরিত্র গঠনে নামাযের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নামায সর্বপ্রকার অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে মানুষকে সর্বদা বিরত রাখে। যে ব্যক্তি নিজেকে সর্বপ্রকার অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়েছে সে অবশ্যই উত্তম চরিত্র–গুণের অধিকারী। অতএব উত্তম চরিত্র গঠনে,উন্নত নৈতিক মান অর্জনে, শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করে আল্লাহর স্মরণ বা তোদাভীরুতা অর্জন করে মহৎ মানুষ তৈরীর জন্য নামায এক কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

অন্য আর একটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ

إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ مَنْ تَزَكّٰى

فَإِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ (الفاطر ١٨)

অর্থাৎ "তুমি (মহানবী) কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। যে কেউ নিজেকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহরই নিকট।" (সূরা ফাতির, আয়াত–১৮)।

এখানেও নিজেকে পরিশুদ্ধ করে উন্নত চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে নামাযের কার্যকর ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মূলতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং এটা বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পর আমাদেরকে আবার সেই মহান প্রভুর কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে, সে ব্যক্তি অবশ্যই নিজেকে পরিশুদ্ধ করে উন্নত চরিত্রসম্পন্ন হতে সচেষ্ট হয়। নামায এধরনের লোককেই স্বীয় প্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে সহায়তা করে।

আমাদের চারিত্রিক পদস্খলনের জন্য শয়তানের প্ররোচনাই প্রধানতঃ দায়ী। শয়তানের এ প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার জন্যও নামায আমাদেরকে বিশেষভাবে সহায়তা করে। নামায হলো আল্লাহর সর্বোৎকৃষ্ট জেকের, আর আল্লাহর জেকের বা স্মরণ যেখানে হয়, শয়তান তার ধারে–কাছেও ঘেঁষতে পারে না। আল্লাহ তাই বলেনঃ

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ـ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا



www.pathagar.com

الشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ - (حٰمٓ والسَّجدة: ٣٧/٣٦)

অর্থাৎ "যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর স্মরণ নেবে, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজ্‌দা করো না, চন্দ্রকেও নয়; সিজ্‌দা কর আল্লাহকে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।" (সূরা হা-মীম-আস্ সাজ্‌দা, আয়াত-৩৬,৩৭)।

নামায মানুষকে পবিত্র করে। নামাযের আগে শরীর পবিত্র করার জন্য ওযু করা (প্রয়োজনে গোছল) ফরয। শরীর পবিত্র করার সাথে সাথে নামাযের স্থান পবিত্র কিনা তাও দেখা আবশ্যক। এরপর দরকার মনের পবিত্রতা আনয়ন। মনের পবিত্রতা সাধন হলে আচার-আচরণ, আমল, আখলাক, চরিত্র সবই পবিত্র ও নিষ্কলুষ হয়। আল্লাহর স্মরণ ও সালাত কায়েমের মাধ্যমেই এরূপ পবিত্রতা অর্জন করা সহজ। আর এরূপ পবিত্রতা অর্জনকারী ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করে থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى (الاعلى: ١٤/١٥)

অর্থাৎ "নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে। এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।" (সূরা আ'লা, আয়াত-১৪, ১৫)।

ব্যক্তি-চরিত্র গঠন, সমস্ত খারাপী থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে ভাল কাজে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করা তথা উত্তম মানুষে পরিণত হওয়া এবং খোদাভীরুতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আল্লাহতায়ালা নামায কায়েমের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় সোয়া শো কোটি মুসলমান রয়েছে। তাদের অনেকেই নামায পড়ে, অনেকে হয়ত ঈপ্সিত লক্ষ্য হাসিলেও সক্ষম হচ্ছেন, কিন্তু সাধারণভাবে মুসলমানগণ কি উত্তম মানবীয় গুণসম্পন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে, তার কারণ কী? কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানগণ এক্ষেত্রে তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ শ্রেণীগুলোকে মোটামুটি এভাবে চিহ্নিত করা চলেঃ

এক) যারা প্রকৃত নামাযী

দুই) যারা নামাযী নয়, এবং

তিন) যারা অনিয়তিমভাবে নামায পড়ে অথবা নামায পড়লেও নামাযে নিষ্ঠাবান নয়; কিংবা নামাযের যথার্থ তাৎপর্য তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি।

**এক**) যারা প্রকৃত নামাযী-নামাযের সমস্ত শরা-শরীয়ত ও নিয়মবিধান মুতাবিক নামায কায়েম করতে সক্ষম হয়েছেন তারা অবশ্যই দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ ও সাফল্য অর্জন করেছেন। তাদের ব্যক্তিগত জীবন হয়েছে সুন্দর,মধুর ও কল্যাণময়। এ শ্রেণীর



www.pathagar.com

লোকদের জন্যই আল্লাহতায়ালা সুসংবাদ দান করেছেনঃ

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا
قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ
هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (الذاريات: ١٥/ ١٨)

অর্থাৎ "সেদিন মুত্তকীরা থাকবে প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে, তাদের প্রতিপালকের দেয়া সব কিছু তারা উপভোগ করবে; কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করতো নিদ্রায়, রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো।" (সূরা যারিয়া'ত, আয়াত -১৫-১৮)।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা বর্তমানে নগণ্য। ফলে সমগ্র মুসলিম সমাজকে তারা প্রভাবিত করতে পারছেন না। অথচ এ শ্রেণীর মুসলমান তৈরী করাই ইসলামী সমাজের দায়িত্ব। এ সম্পর্কে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের (রাঃ) একটি বিখ্যাত আমিরী ফরমান এখানে উল্লেখ্যঃ

"ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি নাফে' থেকে এবং তিনি ইবনে উমরের পুত্র আবদুল্লাহ্‌র মুক্ত দাস থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তাঁর খিলাফতের কর্মচারীদের প্রতি লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, তোমাদের যাবতীয় ব্যাপারের মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নামায কায়েম করা। যে লোক এটাকে রক্ষা করে ও এর সংরক্ষণ করে, সে তার দ্বীনকে রক্ষা করে। আর যে লোক এটা বিনষ্ট করে, সে এ নামায ছাড়াও অন্যান্য সবকিছু অধিক নষ্ট করে।" মুয়াত্তা মালিক।

এটা হযরত উমরের (রাঃ) একটি দীর্ঘ ফরমানের প্রথমাংশ। এটা খলিফার বলা বা লেখা কথা হলেও মূলতঃ এটা নবী করীম (স) এরই বাণী। হাদীস শরীফের অনুসরণেই এ ফরমান রচিত। মহানবী (স) এর যুগে তো বটেই, খোলাফায়ে রাশেদীন-এর আমলে ইসলামের এ অন্যতম প্রধান ভিত্তিকে ব্যক্তি ও সমাজে যথাযথ কায়েম করা ইসলামী হুকুমাতের একটি প্রধান দায়িত্ব হিসাবে পরিগণিত হতো। অথচ বর্তমানে ইসলামের এমন একটি মৌলিক বিধান কার্যকরী করার জন্য মুসলমানদের সমাজে কোথাও হুকুমাতের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় না, এমনকি এটা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজে সামাজিক অনুশাসনও অত্যন্ত শিথিল। এটা কায়েমের ব্যাপারটি মুসলমানদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত আছি। ফলে ব্যক্তিগতভাবে যারা নিষ্ঠার সাথে এটা পালন করছেন, অথবা পরিবেশ অনুযায়ী কোথাও সামাজিক গন্ডীর মধ্যে একদল সচেতন মুসলমান যখন এটা সমষ্টিগতভাবে পালনের চেষ্টা করছেন, তখন এর সুফল তারা অবশ্যই অনুভব করছেন। কিন্তু সেটা সীমিত আকারে। নামাযের বিধান পুরাপুরি কায়েমের মাধ্যমে মুসলমান সমাজ সামগ্রিকভাবে যে শুভ পরিণাম লাভ করতে পারতো তা থেকে আমরা বঞ্চিত।



www.pathagar.com

দুই) দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত মুসলমান, যাদের সংখ্যা বিপুল, তারা আদমশুমারীর হিসাবে মুসলমান হিসাবে গণ্য হলেও ইসলামের বিধান অনুযায়ী তারা নিজেদের জীবন পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। পোষাক-আশাক, আচার-আচরণ, খাওয়া-চলা ইত্যাদি জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে একজন অমুসলমানের সাথে এ ধরনের মুসলমানের মূলগত তেমন কোনই পার্থক্য চোখে পড়ে না। জন্মগতভাবে ইসলাম রূপ এত বড় নিয়ামতের উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অমিতাচারী সন্তানের ন্যায় তারা এর কদর করতে শেখেনি। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পৈত্রিক নামটি ছাড়া (সেটাও অনেক ক্ষেত্রে বিকৃতির শিকার) তাদের গায়ে-গতরে, মন-মানসিকতা কোথাও ইসলাম ও মুসলমানিত্বের তেমন কোন পরিচয় তালাশ করে পাওয়া মুস্কিল। ইসলামের অন্যতম প্রধান রুকন-নামাযের ব্যাপারেও তারা নিতান্ত গাফেল। এদের সম্পর্কেই আল্লাহর রসূল (স) বলেনঃ

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ فَلَا دِيْنَ لَهٗ وَالصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ مَنْ حَفِظَهَا

وَحَفِظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهٗ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ (بيهقى)

অর্থাৎ "যে লোক নামায তরক করে, তার দ্বীন বলতে কিছু নেই। আর নামায হলো দ্বীন ইসলামের খুঁটি কিংবা দাঁড়াবার ভিত্তি। যে লোক এটা রক্ষা করে এবং এর পুরাপুরি হেফাজত করে, সে তার দ্বীনকে রক্ষা করতে পারে। আর যে লোক একে নষ্ট করে, সে এটা ছাড়াও অন্যান্য সব কিছুকে নষ্ট করে।" (বায়হাকী)। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, খলিফা ওমরের (রাঃ) উপরোক্ত ফরমানটি এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত।

মহানবী (স) এর আর একটি হাদীসঃ

অর্থাৎ "মুসলিম বান্দা ও কাফির ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য হলো নামায তরক করা- মুসলমান নামায তরক করে না, কাফির তা করে।

অন্য একটি হাদীসঃ

عَنْ بُرَيْدَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ الْعَهْدَ الَّذِىْ بَيْنَنَا

وَبَيْنَهُمُ الصَّلٰوةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (مسند احمد ترمذى نسائى ابن ماجه)

অর্থাৎ "হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রসূলে করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন নিশ্চয় আমাদের ও ইসলাম গ্রহণকারী সাধারণ লোকদের পরস্পরে নামাযের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কাজেই যে লোক নামায তরক করবে, সে যেন কুফরির পথ গ্রহণ করল।" মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)।

আরেকটি হাদীসঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ

الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ (مسلم)



www.pathagar.com

অর্থাৎ "হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসুলে করীম (স) ইরশাদ করেনঃ আল্লাহর বান্দা ও কুফর ও শিরক–এর মাঝে নামায ত্যাগ করাই ব্যবধান মাত্র।" (মুসলিম)।

হযরত আবু দারদা বর্ণিত অপর একটি হাদীসের ভাষা নিম্নরূপঃ

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ اَوْصَانِى خَلِيْلِىْ اَنْ تُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَ اِنْ قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكَ صَلٰوةً مَّكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا اَلْقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ (ما بن ماجة)

অর্থাৎ "(১) আল্লাহর সাথে একবিন্দু পরিমাণও শিরক করবে না–তোমাকে ছিন্ন–ভিন্ন ও টুকরা টুকরা করা কিংবা আগুনে ভস্ম করে দেয়া হলেও। (২) সাবধান, কখনো ইচ্ছা বা সংকল্প করে কোন ফরয নামায ত্যাগ করো না। কেননা যে লোক ইচ্ছাপূর্বক নামায ত্যাগ করে, তার উপর থেকে আল্লাহতায়ালার সে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়, যা অনুগত ও ঈমানদার বান্দার জন্য আল্লাহতায়ালা গ্রহণ করেছেন। (৩) আর কখনো মদ্যপান করবে না। কেননা এটা সর্বপ্রকার অন্যায়, পাপ ও বিপর্যয়ের কুঞ্চিকা।" (ইবনে মাজাহ্)।

নামায সম্পর্কিত অপর একটি হাদীসের শেষাংশঃ

مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ -

অর্থাৎ "যে লোক ইচ্ছা করে ফরয নামায তরক করবে সে মুসলিম মিল্লাত থেকে, মুসলিম সমাজ ও জাতি থেকে বের হয়ে গেছে বুঝতে হবে।"

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে এটা অকাট্যভাবে প্রমাণ হয় যে, নামায ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ঈমানের ঘোষণা দেয়ার পর ইসলামের বাস্তব অনুসরণের প্রধান ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো নামায। অতএব, ইচ্ছাপূর্বক নামায পরিত্যাগ করলে মুসলমান হিসাবে দাবী করার কিছুই থাকে না। উপরোক্ত হাদীসমূহের ভাষা এব্যাপারে সুস্পষ্ট। তাই ইচ্ছাপূর্বক নামায তরক করলে সে মুসলিম মিল্লাত থেকে দূরে সরে যায় তাই নয়, আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ ও রহমত থেকেও সে বঞ্চিত হয়। কোরআন শরীফে বহু স্থানে আল্লাহ বিভিন্ন অবস্থা, প্রসঙ্গ ও উদাহরণ উপস্থাপন করে বান্দাহকে নামায কায়েম করার হুকুম দিয়েছেন এভাবেঃ

অর্থাৎ "নামায কায়েম কর।" اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

এতৎসত্ত্বেও কী করে আল্লাহর সে হুকুম অমান্য করা চলে এবং এভাবে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা সত্ত্বেও মুসলমান হিসাবে দাবী করা এবং আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত?



www.pathagar.com

তিন) তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত মুসলমান তারা নামাযও পড়ে আবার সব ধরনের লজ্জাজনক, অশ্লীল কাজ ও পাপাচারেও লিপ্ত থাকে। মিথ্যা বলা, অন্যকে ফাঁকি দেয়া, অন্যায় ও নানারূপ কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করাকে তারা দুনিয়াদারীর স্বাভাবিক নিয়ম-নীতি বলে ধরে নেয়। অনেকে আছে যারা ঘুষ, মদ, জুয়া, ব্যাভিচার এমনকি, দেশাচার ও তথাকথিত সংস্কৃতির নামে নানারূপ শেরক্ ও কুফরীর কাজেও এমনভাবে লিপ্ত যে অমুসলমানদের সাথে তাদের পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তারা অভ্যাসবশতঃ ওয়াক্তিয়া নামাযের আনুষ্ঠানিকতাও সম্পন্ন করে থাকে। কিন্তু নামায যে কলুষমুক্ত বিপ্লবী মানবীয় চরিত্র সৃষ্টি করতে চায়, পৃথিবীর সমস্ত অন্যায়, পাপাচার ও চিন্তা-চেতনা থেকে বিরত রেখে ন্যায় ও সুকৃতির দিকে মানুষকে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হবার জন্য প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ করে এ শ্রেণীর নামাযীরা সে ব্যাপারে চরমভাবে উদাসীন। অন্যায় ও গর্হিত কাজ ও চিন্তা থেকে বিরত না হয়ে মাঝে-মধ্যে শুধু বাঁধা-ধরা নিয়মে ওঠা-বসা করায় তেমন কোনই ফায়দা নেই। এ শ্রেণীভুক্ত নামাযীদের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেনঃ

অর্থাৎ "সুতরাং দুর্ভোগ সে সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য এটা করে (অর্থাৎ নামায পড়ে)।" (সূরা মাউন, আয়াত-৪, ৫, ৬)।

এধরনের নামায সম্পর্কে তিরমিযী শরীফের একটি বিখ্যাত হাদীস নিম্নরূপঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اِنَّ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَاِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَةٍ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكْمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلٰى ذٰلِكَ (ترمذى)

অর্থাৎ "হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রসূলে করীমকে (স) বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন বান্দার আমল পর্যায়ে সর্বপ্রথম তার নামায সম্পর্কে হিসাব নেয়া হবে। তার নামায যদি যথাযথ প্রমাণিত হয় তবে সাফল্য ও কল্যাণ লাভ করবে। আর যদি নামাযের হিসাবই খারাপ হয় তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নামাযের



www.pathagar.com

ফরযের হিসাবে যদি কিছু কম পড়ে,তবু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তখন বলবেনঃ তোমরা দেখ, আমার বান্দার কোন নফল নামায বা নফল বন্দেগী আছে কিনা, যদি থাকে তা হলে এর দ্বারা ফরযের কমতি পূরণ করা হবে। পরে তার অন্যান্য সব আমল এরই ভিত্তিতে বিবেচিত ও অনুরূপভাবে কমতি পূরণ করা হবে।"

অতএব, এটা সুস্পষ্ট হলো যে, যেন-তেন প্রকারে, কোনভাবে নামাযের শুধু আনুষ্ঠানিকতা পালন করলেই হবে না, নামাযের আনুষঙ্গিক যাবতীয় শর্তাদি পূরণ করে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নামায পড়তে হবে এবং নামায-শেষেও আল্লাহকে সর্বাবস্থায় স্মরণ করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (الجمعة: ١٠)

অর্থাৎ "সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সুরা জুমু'আ, আয়াত-১০)

উপরোক্ত হাদীস ও আয়াতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান মুসলিম সমাজে একশ্রেণীর নামাযীদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে তাদের নামায আল্লাহর দরবারে কতটুকু কবুল হবে, উক্ত নামাযের উদ্দীষ্ট ফায়দা কেন তাদের জীবনে অনুভূত হচ্ছে না এবং আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ ও অপরিসীম নিয়ামত থেকে আজকের মুসলিম সমাজ কেন বঞ্চিত তা সহজেই অনুমান করা চলে।

নামাযের আর একটি অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো জামায়াতের সাথে নামায পড়া। জামায়াতের সাথে নামায পড়ার মধ্যে যে শৃংখলা, সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দেয়া হয়, ব্যক্তি জীবনে তার প্রভাব যেমন শুভ ফলদায়ক, তেমনি সুশৃংখল, শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণময় সমাজ গঠন ও পরিচালনার জন্যও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, এতে আরো একটি শিক্ষার দিক রয়েছে। এককভাবে কোন ব্যক্তি কিছু সংখ্যক সদগুণ অর্জন করলেই পুরা সমাজে শান্তি-শৃংখলার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে না। অবশ্য একথা সত্য, ব্যক্তি দিয়েই সমাজ। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যখন সদগুণাবলীর অধিকারী হয় তখন গোটা সমাজই সৎ-সমাজে পরিণত হয়। কিন্তু শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আরো কিছু অপরিহার্য শর্ত রয়েছে। তা হলো সুশৃংখল, খোদাভীরু, সংঘবদ্ধ একদল সচেতন মানুষ যারা ইবলিসী প্ররোচনা থেকে সমাজ ও সমাজের মানুষকে মুক্ত করে খোদায়ী প্রেরণায় তাদেরকে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। এ সংঘবদ্ধ সামাজিক প্রচেষ্টা ব্যতীত ঈপ্সিত শান্তিপূর্ণ, কল্যাণময় সমাজ কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। জামায়াতে নামায পড়ার বিধান থেকে আমরা এ শিক্ষাই লাভ করি। সামষ্ঠিকভাবে যখন সমাজের মানুষ সদ্‌গুণাবলী অর্জনে সচেষ্ট হয় এবং নিজেদের জীবন ও সমাজ থেকে লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা ও সর্বপ্রকার পাপাচার নির্মূল করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়-সেখানে

www.pathagar.com

আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুতি, শান্তি ও কল্যাণের অনাবিল ফল্গুধারা অবারিতভাবে প্রবাহিত হয়। তাই দেখা যায়, জামায়াতে নামায পড়ার বিধান সামাজিক ঐক্য ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক সহনশীলতা ও সমমর্মিতা সৃষ্টি ও সংঘবদ্ধভাবে শান্তি ও কল্যাণময় সুশৃংখল সমাজ গঠনের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ (الشورى: ٣٨/٤٠)

অর্থাৎ "যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের কাজ সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। আল্লাহ জালেমদেরকে পছন্দ করেন না।" (সুরা শূরা, আয়াত৩৮-৪০)।

জামায়াতে নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে এখানে দু'টি হাদীসের উল্লেখ করা যেতে পারে। নীচে উল্লিখিত প্রথম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন প্রখ্যাত হাদীসবিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা)। তাঁর বর্ণনা মতে নবী করীম (স) বলেছেনঃ "জামায়াতের সাথে নামায পড়া একাকী পড়ার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশী উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্ন।" (বুখারী, মুসলিম)। হাদীসটির মূল ভাষা নিম্নরূপঃ

صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وعشرين دَرَجَةً

(متفق عليه)

দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বিশিষ্ট সাহাবা হজরত আবু হুরায়রা (রা)। তাঁর বর্ণনামতে, কোন এক নামাযে মহানবী (স) কিছুসংখ্যক লোককে দেখতে না পেয়ে বললেনঃ "আমি স্থিরভাবে মনস্থ করেছি যে, একজন লোককে নামায পড়তে আদেশ দিয়ে আমি সেসব লোকদের নিকট চলে যাব, যারা নামাযে অনুপস্থিত থাকে। অতঃপর কাঠ জমা করে তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিতে বলব।" হাদীসের মূল ভাষা নিম্নরূপঃ

فَقَدْ فَاسَافِىْ بَعْضِ الصَّلٰوةِ نقال لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلًا يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اُخَالِفُ اِلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْهَا فَاٰمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوْا



www.pathagar.com

عَلَيْهِمْ فَحَرِّمِ الْحَطَبَ بُيُوتَهُمْ (متفق عليه)

উপরোক্ত হাদীস দুটো থেকে জামায়াতে নামায পড়ার ক্ষেত্রে রসূলে করীম (স) কতটা তাগিদ বা গুরুত্ব দিয়েছেন তা সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

## নামাযের ওয়াক্তসমূহঃ

আল্লাহতায়ালা স্বয়ং ফিরিশতা জিবরাঈল (আ) এর মাধ্যমে মহানবী (স) কে নামায পড়ার নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। নামাযের বিভিন্ন ওয়াক্তও আল্লাহ নিজেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহবলেনঃ

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ـ (طٰهٰ: ١٣٠)

অর্থাৎ "সুতরাং তারা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। রাত্রিকালে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং দিবসের প্রান্তসমূহেও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।" (সূরা তাহা, আয়াত-১৩০)।

এখানে সূর্যোদয়ের পূর্বে ফযর, সূর্যাস্তের পূর্বে আছর, রাত্রিকালে মাগরিব ও এশা এবং দিবসের প্রান্তে অর্থাৎ সূর্য পশ্চিমে হেলে যাওয়ার পর জুহর এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিবরণ দেয়াহয়েছে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়া সম্পর্কে 'হাদীসুল ইসরা' বা মিরাজ সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ নিম্নরূপ। হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হাদীসটি বর্ণনা করেছেনঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ (ص) الصَّلٰوةُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِيْنَ ثُمَّ نُقِصَتْ حَتّٰى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُوْدِيَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ بِهٰذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِيْنَ ـ (مسند احمد، ترمذى، نسائى)

অর্থাৎ "তিনি বলেন, নবী করীম (স) এর প্রতি মি'রাজের রাতে প্রথমত পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল। পরে তা কমিয়ে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত স্থায়ীভাবে করে রাখা হয়। অতঃপর উদাত্তভাবে ঘোষণা করা হয়, হে মুহাম্মদ! নিশ্চয় জেনে রাখ, আমার নিকট



www.pathagar.com

গৃহীত সিদ্ধান্ত কখনো পরিবর্তিত হয় না। তোমার জন্য এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান।" মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী, তিরমীযি)।

এ হাদীস আল্-কোরআনের উপরোক্ত আয়াতেরই প্রতিধ্বনী। এ থেকে জানা যায়, ফরয নামায কেবলমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত। শুক্রবারে জু'মায়ার নামায জুহর নামাযের স্থলাভিষিক্ত, অতএব ওটাও ফরয। মি'রাজের পূর্বেও নবী করিম (স) নামায পড়তেন। কিন্তু তখনকার নামায ছিল প্রধানতঃ রাত্রিকালীন এবং তখন নামাযের রাকআত এবং সময়ও নির্দিষ্ট ছিল না। মে'রাজের প্রত্যক্ষ অবদান হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামায। এ সম্পর্কে আরো দুটি বিখ্যাত হাদীসের উল্লেখ করছি। প্রথম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত উবাদা ইবনুস সাবেত (রা)। তাঁর বর্ণনা মতে,

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (ر) اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ خَمْسُ صَلَوٰتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ اَتٰى بِهِنَّ وَلَمْ يُضَيِّعْ بِحَقِّهِنَّ شَيْئًا اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ فَاِنَّ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَّمْ يَاْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ۔

(بدائع الصنائع فی ترغیب الشرائع)

অর্থাৎ "আমি রাসূলে করীম (স) কে বলতে শুনেছিঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামায আল্লাহতায়ালা বান্দাদের উপর ফরয করেছেন। যে লোক এটা যথাযথভাবে আদায় করবে এবং এর অধিকার ও মর্যাদার প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে, এর একবিন্দু নষ্ট হতে দেবে না তার জন্য আল্লাহর নিকট প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তিনি তাকে বেহেস্তে দাখিল করবেন। আর যে লোক তা (নামায) পড়বেনা তার জন্য আল্লাহর নিকট কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে আযাব দিবেন, আর ইচ্ছা করলে জান্নাতে দাখিল করবেন।" (বাদায়ে উস্সানায়েও)।

দ্বিতীয় হাদীসটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সঠিক সময় নির্ধারণমূলক। এটি বর্ণনা করেছেন প্রখ্যাত সাহাবা হযরত আবু হুরায়রা (রা) তিনি বলেনঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اَوَّلًا وَّاٰخِرًا وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الصَّلٰوةِ الظُّهْرِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَاٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ حِيْنَ يَدْخُلُ



www.pathagar.com

وَقْتُهَا وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ إِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَغِيْبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَغِيْبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَطْلُعُ الشَّمْسُ - (ترمذى)

অর্থাৎ "নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক নামাযেরই একটি প্রথম সময় রয়েছে এবং রয়েছে একটি শেষ সময়। এর বিবরণ এই যে, জুহরের নামাযের প্রথম সময় শুরু হয় তখন, যখন সূর্য মধ্য আকাশ থেকে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ে। এর শেষ সময় আসরের নামাযের সময় শুরু হবার সময় পর্যন্ত থাকে। আসরের নামাযের প্রথম সময় শুরু হয় ঠিক এর সময় সূচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই। আর এর শেষ সময় তখন পর্যন্ত থাকে যখন সূর্যরশ্মি হরিৎবর্ণ ধারণ করে।.মাগরিব নামাযের সময় শুরু হয় যখন সূর্যাস্ত ঘটে। আর এর শেষ সময় তখন পর্যন্ত থাকে যখন সূর্যাস্তকালীন রক্তিম বর্ণের লালিমা নিঃশেষে মুছে যায়। এশার নামাযের প্রথম সময় সূচিত হয় যখন সূর্যাস্তকালীন রক্তিম আভা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এর শেষ সময় দীর্ঘায়িত হয় অর্ধেক রাত পর্যন্ত। আর ফযরের প্রথম সময় শুরু হয় উষার উদয়লগ্নে এবং এর শেষ সময় সূর্যোদয় পর্যন্ত থাকে।"

নামায হলো মুমিনের জন্য সঠিক দিগ্-দর্শন যন্ত্রস্বরূপ। বিস্তীর্ণ দুনিয়ার বুকে মানুষ চলতে চলতে কখনো পথ হারিয়ে ফেলতে পারে। দৈনিক পাঁচ বার মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনি তাকে সঠিক মনযিল মকছুদের দিকে উদাত্ত আহবান জানায়। মসজিদে দৌড়ে গিয়ে সে আল্লাহর সামনে অবনত মস্তকে ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বার বার ঘোষণা করে, সে একমাত্র মহান প্রভু আল্লাহরই বান্দা, একমাত্র আল্লাহর মর্জি মুতাবিক চলাই তার কাজ এবং সমস্ত প্রকার অন্যায়, অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত হয়ে সর্বোত্তম মানবীয় গুণাবলী অর্জন করে দুনিয়া ও আখিরাতে অফুরন্ত শান্তি ও কল্যাণ লাভ করাই তার একমাত্রউদ্দেশ্য।

নামায মুমিনের জন্য মি'রাজস্বরূপ। এটা ইস্‌রা ও মিরাজের সেই বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পবিত্র মিরাজের রাত্রিতে বোর্‌রাকে আরোহণ করে মহানবী (স) ফিরিশতা জিবরাঈল (আ) এর সাথে প্রথমে বায়তুল আকসায় গমন করেন। অতঃপর সপ্ত আসমান পরিভ্রমণ করে সৃষ্টি-জগতের শেষ প্রান্ত 'ছিদরাতুল মুন্‌তাহা'য় উপনীত হয়েছিলেন-যে স্থান অতিক্রম করে উর্ধাকাশে গমনের ক্ষমতা আল্লাহ পাক ফিরিশতা জিবরাঈল (আ) কেও প্রদান করেননি। সেখান থেকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তাঁর খাস মেহমান হিসাবে মহানবী (স) কে আল্লাহতায়ালা তাঁর মুবারক সান্নিধ্য লাভের



www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে আরশে মুয়াল্লাকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি আল্লাহর পাক দিদার লাভ করেছিলেন এবং তাঁর সাথে কথপোকথন করেছিলেন। সেই কথপোকথনের স্মৃতির স্মরণে তার খানিকটা আমরা প্রতিদিন নামাযে 'তাশাহুদ' হিসাবে পাঠ করে থাকি। এমন চরম ও পরম সৌভাগ্য দ্বিতীয় কোন মানুষের জীবনে ঘটেনি, ঘটার সম্ভাবনাও নেই। সেখানে আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবকে বেহেশত-দোযখ, পৃথিবীর আদি-অন্ত, কিয়ামত-আখিরাত, সৃষ্টি-রহস্যের নিগূঢ়তম জ্ঞান ও হিকমত ইত্যাদি সবকিছু প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন। সে মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য থেকে মানব জাতির শান্তি, কল্যাণ, মাগফিরাত ও সাফল্যের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তোহ্‌ফাস্বরূপ যে পরম নিয়ামতসমূহ নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে নামায হলো অন্যতম এবং নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম। মুমিন বান্দা যখন নিবিষ্ট চিত্তে নামাযের নিয়তে জায়নামাযে দাঁড়ায়, তখন তার সামনে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ থাকে না। সরাসরি সে আল্লাহর সান্নিধ্যে, আল্লাহর শেখানো ভাষায় কাতর-চিত্তে আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় রত হয়। এটাই হলো মুমিনের জন্য মি'রাজ। প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচ বার মু'মিন-জীবনে এ মি'রাজের সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

এ মি'রাজের অবস্থায় আমরা আমাদের স্রষ্টার সাথে কী সব কথাবার্তা বলি বা ওয়াদা অঙ্গীকার করি তা একবার পর্যালোচনা করা দরকার। প্রতি রাকায়াত নামাযের শুরুতে একবার সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করা হয়, যার অর্থ "(পরম করুণাময় আল্লাহর নামে) সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক, আল্লাহরই প্রাপ্য, যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু, কর্মফল দিবসের মালিক। আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর, তাদের পথ, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছো, যারা ক্রোধ-নিপতিত নয়, পথভ্রষ্টও নয়।"

এছাড়া আল্লাহর নাযেলকৃত ওহীর ভাষায় আরো ভাল ভাল কথা বলি, অনেক ওয়াদা-অঙ্গীকার করে রাব্বুল আলামীনের দরবারে কাতর-চিত্তে, সাশ্রু-নয়নে অনেক কাকুতি-মিনতি করে নামায শেষ করি। এখন চিন্তা করা দরকার, এভাবে প্রত্যহ কমপক্ষে পাঁচ বার নামায আদায় করার পর মুমিনের জীবনে উদ্দীষ্ট মানবীয় গুণাবলী অর্জিত না হবার কোন সঙ্গত কারণ আছে কি? এভাবে নামায আদায়কারী কোন মুসলমান কি কখনো কোন প্রকার পাপাচারে লিপ্ত হতে পারে? তাই বলা চলে, নামায হলো মহত্তম মানবীয় গুণাবলী অর্জনের ক্ষেত্রে একান্ত কার্যকর বাস্তব ট্রেনিং। সমাজের সকল মানুষ যদি এভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে পাপাচার থেকে বিরত হয়ে সদ্‌গুণাবলী অর্জনে সর্বদা সজ্ঞানে সচেষ্ট হয়, তাহলে সে সমাজে অন্যায় প্রতিরোধ বা আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য কোন পুলিশ বাহিনী নিয়োগেরও প্রয়োজন পড়ে না। মুমিনের জাগ্রত বিবেক বা ঈমানী চেতনাই সকল প্রকার খারাপ কাজ ও পাপাচার থেকে ব্যক্তি ও সমাজকে নিবৃত্ত রাখে। রহমতের ফিরিশতাগণ সে সমাজে নিরাপত্তা বাহিনীর চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে,যে সমাজে আল্লাহর আইন কায়েম হয় সেখানে মানুষের অনুশাসন বা পুলিশী তদারকীর তেমন কোনই প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয় না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল মহানবী (স) এবং খোলাফায়ে রাশিদীনের পরিচালিত তৎকালীন মুসলিম



www.pathagar.com

সমাজ। সে সমাজে অন্যায় ও পাপাচার ছিল না বললেই চলে। তা সত্ত্বেও শয়তানের ওয়াসওয়াসায় কেউ কখনো কোনরূপ পাপাচারে লিপ্ত হলে, হয় ইসলামী প্রশাসন তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতো, না হয় প্রচলিত ইসলামী অনুশাসনের প্রভাবে পাপাচারী নিজেই অনুতপ্ত হয়ে স্বেচ্ছায় নিজেকে সোপর্দ করে দিত, শরীয়ী বিধান তার উপর কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে। পুলিশ দিয়ে তাকে পাকড়াও করে আদালতে নেয়ার, সাক্ষী-সাবুত খাড়া করে, দীর্ঘদিন যাবৎ জেরা করে, উকিল-মোক্তার, আইনের মারপ্যাচে ফেলে তাকে কাবু করার কোন প্রয়োজনই পড়তো না। বিচার ছিল সেখানে ঈমানের মাপকাঠি, পাপ-পুণ্যের নিক্তি এবং বেহেশত-দোযখের ফয়সালাকারী। তাই বিচারক সেখানে আল্লাহর ভয়ে কাঁপত, বিচারপ্রার্থী সেখানে ঈমানের তাকাযায় তীব্র অনুশোচনানলে দগ্ধ হতো। তাই সে বিচার ছিল তৎকালীন সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি।

নামায এ নিষ্কলুষ, শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠারই প্রতিশ্রুতি দেয়।

## রোযা

ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ হলো রোযা। রোযা সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনপাকে ঘোষণা করেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ـ

"ইয়া আইয়ুহাল্‌লাযিনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস্ সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযিনা মিন কাবলেকুম।" অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল।" একথার দ্বারা প্রমাণ হয়, আল্লাহর তরফ থেকে যত শরীয়ত দুনিয়ায় নাযিল হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই রোযা রাখার বিধি-ব্যবস্থা ছিল। চিন্তা করার বিষয়, রোযার মধ্যে এমন কি বস্তু নিহিত, যে জন্য আল্লাহতায়ালা সকল যুগের শরীয়তেই এই বিধানকে অপরিহার্য গণ্য করেছেন।

কলেমা আমাদেরকে হক ও বাতিল, ন্যায় ও অন্যায়, কল্যাণ ও অকল্যাণ তথা সকল সুকৃতি ও দুষ্কৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দান করে এবং সেভাবে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণে সাহায্য করে। সকল মিথ্যা, অন্যায়, অসত্য ও অজ্ঞানান্ধকার থেকে আমাদেরকে রাব্বুল আলামীনের সরল, সঠিক, অভ্রান্ত পথের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশ দান করে। অতঃপর নামায আমাদেরকে সকল প্রকার পাপাচারমুক্ত মহত্তম মানবীয় গুণসম্পন্ন আশরাফুল মখলুকাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে প্রেরণা যোগায়। কিন্তু রোযা আমাদেরকে আরো উর্ধে অর্থাৎ ফেরেশতার গুণাবলীতে ভূষিত করে। ফেরেশতাগণ যেমন পানাহার, নারী-সাহচর্য, হিংসা-বিদ্বেষ এবং সমস্ত প্রকার কুপ্রবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, রমযানের একটি মাসেও তেমনি আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এ সমস্ত কাজ থেকে বিরত থেকে ফেরেশতার গুণাবলী অর্জনের ট্রেনিং নেই। এ ট্রেনিং ফেরেশতাদের চেয়েও কঠিন এ জন্য যে,



www.pathagar.com

ফেরেশতাগণ কোন ধরনের প্রবৃত্তির বশীভূত নয়, সকল প্রবৃত্তির উর্ধে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার উদ্দেশ্যেই তাঁদের সৃষ্টি। কিন্তু মানুষ পানাহার, নারী-সাহচর্য এবং নানা ধরনের প্রবৃত্তির দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও রমযানের পূর্ণ একটি মাস দিনের বেলায় এসব কাজ থেকে বিরত থেকে চরম তিতিক্ষা ও সংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। কলেমা এবং নামায মানুষকে সমস্ত হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়, কিন্তু হালাল কাজে বাধা দেয় না বরং উদ্বুদ্ধ করে। আর রোযা আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বহুবিধ হালাল কাজ থেকেও বিরত থাকার ট্রেনিং দেয়। হালাল খাদ্য-পানীয়, স্ত্রীর অন্তরঙ্গ সাহচর্য ইত্যাদি যেসব কাজ অন্য সময়ে আমাদের জন্য শুধু জায়েযই নয়, অপরিহার্য-রোযা অবস্থায় তা আমাদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ রোযার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহ বলেনঃ "লাআল্লাকুম তাত্তাকুন"-অর্থাৎ "(যাতে রোযা পালনের মাধ্যমে) তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পার।" পরহেজগারী হাসিল করাই রোযার উদ্দেশ্য বলে আল্লাহ ঘোষণাকরেছেন।

অভাবের সংসারে অনেক সময় বাধ্য হয়ে অর্ধাহারে-অনাহারে থাকতে হয়, ঘরে স্ত্রী না থাকলে অগত্যা নারী-সঙ্গ বর্জন করতে হয়। কিন্তু যার ঘরে খাবার মত সামগ্রী ও পানীয় রয়েছে, ঘরে মোহিনী স্ত্রী বর্তমান, তার পক্ষে সেগুলো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বর্জন করে চলা নিশ্চয়ই দুরূহ। রোযাদার দীর্ঘ একমাস যাবৎ সে দুরূহ কাজেরই ট্রেনিং নেয় একমাত্র আল্লাহকে খুশী-রাজী করার উদ্দেশ্যে। এটাই হচ্ছে তাকওয়া বা পরহেজগারী। রোযাদার চরম পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও ঘরে মওজুত লোভনীয় নানা খাদ্য-সামগ্রী ও পানীয়ের দিকে হাত বাড়ায় না, প্রবৃত্তির তাড়না থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর দিকে লালসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। ঘরের দরজা বন্ধ করে, লোক-চক্ষুর অন্তরালেও সে এসব কাজ করে না শুধু এজন্য যে, সে যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে রোজা রাখছে সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ সর্বত্রগামী, তাঁর দৃষ্টি এবং করায়ত্তের বাইরে কোন কিছুই নয়। বিশ্ব জগতের সবকিছুর তিনিই স্রষ্টা এবং তিনিই নিয়ন্তা। মানুষের অন্তররাজ্যে প্রতিনিয়ত যে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা,ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হচ্ছে তিনি সে সবকিছুরও খবর রাখেন। মহাসমুদ্রের অতল গভীরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ও সে মহাপ্রভুর দৃষ্টি এড়ায় না, আবার নিঃসীম নীলাভ্রের সর্বোচ্চ স্তরের সীমাহীন রহস্যময় আশ্চর্য-জগতের সবকিছুও তাঁরই সৃষ্টি এবং সেসব নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠিও তাঁরই হাতে। মৃত্যুর পরেও আবার তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হয়, তিনিই আমাদের আমল অনুযায়ী ভাল-মন্দ পরিণতি দান করার একমাত্র মালিক। আসমান-যমীন বিস্তৃত এ মহাসাম্রাজ্যের যিনি অধিপতি, সকল সৃষ্টি এবং তার প্রতিপালন, মৃত্যু বা ধ্বংস এবং পুনরুত্থানের যিনি মালিক ঘরের দরোজা বন্ধ করে দিলেই অথবা লোক-চক্ষুর অন্তরালে গেলেই কি সেই মহান অধিপতির দৃষ্টির বাইরে যাওয়া সম্ভব? এ মহান সর্বশক্তিমানকে সর্বাবস্থায় একান্তভাবে অনুভব করে সকল অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে নিজেকে বিরত রেখে, একমাত্র তাঁর মর্জি মাফিক জীবন পরিচালনার সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টার নামই তাকওয়া পরহেজগারী। এ গুণ অর্জন করাই রোযার উদ্দেশ্য বলে আল্লাহতায়ালা উল্লেখকরেছেন।



www.pathagar.com

এভাবে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত কোন ব্যক্তির দ্বারা কি কখনো কোন অন্যায় বা পাপ সংঘটিত হতে পারে? অবশ্যই নয়। এ ধরনের একদল তাকওয়াসম্পন্ন লোক যখন কোন সমাজে তৈরী হয়ে যায় ( সে রূপ লোক তৈরীর জন্যই রমযানের পুরো একমাস রোযাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে) তখন সে সমাজ হয় শান্তি, শৃংখলা ও সুকৃতিপূর্ণ অনুপম সমাজ। সে সমাজেই প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহর খেলাফত বা হুকুমাতে ইলাহী। ইবলিস সে সমাজের দৃঢ় প্রাচীরে মাথা কুটে মরে।

কিন্তু বাস্তবে আমরা আজ কী দেখতে পাই? গোটা মুসলিম সমাজ পুরো একটি মাস রোযা রাখার সাড়ম্বর মহড়া দেয়, অথচ সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজে তাকওয়া অর্জনের কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না। ব্যক্তিগতভাবে কিছু লোক উদ্দীষ্ট গুণাবলী অর্জনে সক্ষম হলেও সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজে এ গুণ পরিদৃষ্ট হয় না। তাই ঈপ্সিত সুকৃতিপূর্ণ ইসলামী সমাজ গঠনও সম্ভব হয় না। রোযার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে, প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করে যারা একমাত্র আল্লাহর জন্য রোযা রাখে কেবল তারাই তাকওয়ার গুণ অর্জনে সক্ষম। অন্যথায় সাড়ম্বরে রোযা রাখার আনুষ্ঠানিক মহড়া যতই দেয়া হোক না কেন, তাতে তাকওয়ার গুণ অর্জিত হয় না এবং সুকৃতিপূর্ণ অনুপম সমাজ গঠনও সুদূর পরাহত থেকে যায়। এধরনের আনুষ্ঠানিক রোযা পালনকারীদের সম্পর্কেই আল্লাহর রাসুল বলেছেনঃ

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করে না, তার শুধু খানাপিনা পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনই প্রয়োজন নেই।" (বোখারী শরীফ)।

অন্য আর একটি হাদীসে আছেঃ

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوْعُ ۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ ۔

অর্থাৎ "অনেক রোযাদার এমন আছে কেবল ক্ষুধা আর পিপাসা ছাড়া যাদের ভাগ্যে অন্য কিছুই জোটেনা। তেমনি রাত্রিতে ইবাদতকারী অনেক মানুষও এমন আছে, যাদের রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না।"

অন্য আরো একটি হাদীসঃ

الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّيْ امْرُؤٌ صَائِمٌ (بخارى۔ مسلم)



www.pathagar.com

অর্থাৎ "রোযা ঢালস্বরূপ। তোমাদের কেউ কখনো রোযা রাখলে তার মুখ থেকে যেন খারাপ কথা বা গালিগালাজ বের না হয়। কেউ যদি তাকে গাল-মন্দ করে বা ঝগড়া-বিবাদে প্ররোচিত করে তবে সে যেন বলে, আমি রোযাদার।" (বোখারী ও মুসলিম)।

মোটকথা, আত্মসংযম ও খোদাভীতি অর্জন হলো রোযার শিক্ষা। এ শিক্ষার দ্বারা শুধু রমযান মাসেই অনুপ্রাণিত হতে হবে তা নয়; বছরের বাকি এগারটি মাস তথা সমগ্র জীবনেই এ শিক্ষা অনুযায়ী চলা বাঞ্ছনীয়। কোন মু'মিন যখন কঠোর সাধনার মাধ্যমে রমযান মাসে কতগুলো গুণ অর্জন করে, রমযান মাস শেষ হলেই সেসব গুণাবলী সে পরিত্যাগ করবে এটা কি করে আশা করা যায়? কোন মু'মিন তা করতে পারে না। যদি কেউ তা করে তাহলে সে প্রকৃত মু'মিন নয়; অথবা রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সে মোটেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি।

আত্মসংযম এমন একটি কষ্টার্জিত গুণ যার দ্বারা মানুষ নিজ প্রবৃত্তিকে বশীভূত করে ফেরেশতার গুণে গুণান্বিত তথা আশরাফুল মখলুকাতের স্তরে উপনীত হতে পারে। এ আত্ম-সংযম যখন হয় একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মহত্তম প্রেরণায় তখন তা হয় পরিপূর্ণরূপে সার্থক। রোযার আত্মসংযম ও একমাত্র আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রোযা রাখার মাধ্যমেই মানব জীবনের এ চরম ও পরম সাফল্য অর্জিত হয়। তাই রোযা নিঃসন্দেহে ইবাদতগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ যা ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃত মুনষ্যত্ব বা আশরাফুল মখলুকাতের গুণ সৃষ্টি করে। এ ধরনের প্রকৃত মনুষ্যত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত সমাজ অবশ্যই আদর্শ মানব সমাজ রূপে গণ্য হবার যোগ্য।

যে কোন মানুষের জীবনে তিনটি বিষয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমতঃ পানাহার, দ্বিতীয়তঃ যৌন-সম্ভোগ, তৃতীয়তঃ আরাম-আয়েশ। রমযান মাসে এ তিনটি ক্ষেত্রেই রোযাদারকে চরম সংযমের পরীক্ষা দিতে হয়। একমাত্র স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর বান্দাহ এ পরম কাংক্ষিত বিষয়গুলো থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত রেখে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। বান্দাহর এ কঠোর ত্যাগ, ধৈর্য ও সংযমের বিনিময়ে আল্লাহতায়ালা অসংখ্য নিয়ামত নির্ধারণ করে রেখেছেন। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছেঃ

اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ -

অর্থাৎ "রোযা একমাত্র আমার (আল্লাহ) জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।" 'যে মু'মিন তার যৌন-কামনা, খাদ্য ও পানীয় একমাত্র আমার জন্য পরিত্যাগ করলো, আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব'-আল্লাহতায়ালার এ ঘোষণা পরকালে রোযাদারের জন্য আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতের নিশ্চয়তাজ্ঞাপক।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে রমযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশদরূপে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম (স) শাবান মাসের শেষ দিন আমাদের সাহাবাদের সম্বোধন করে ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেনঃ



www.pathagar.com

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ
خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا
مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا
سِوَاهُ وَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا
سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ
وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً
لِذُنُوْبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ
أَنْ يَّنْتَقِصَ مِنْ اَجْرِهِ شَيْءٌ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ
مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُعْطِى اللّٰهُ هٰذَا الثَّوَابَ
مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى مَذْقَةِ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ
وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِىْ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتّٰى
يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَاٰخِرُهُ
عِتْقٌ مِنَ النَّارِ - وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهِ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ
وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ (بيهقى فى شعب الايمان)

অর্থাৎ "জনগণ! এক মহাপবিত্র ও বরকতের মাস তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছে। এ মাসের একটি রাত বরকত ও ফযীলত-মাহাত্ম্য ও মর্যাদার দিক দিয়ে সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। এ মাসের রোযা আল্লাহতায়ালা ফরয করেছেন এবং এর রাতগুলিতে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ানোকে নফল ইবাদতরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। যে ব্যক্তি রমযানে আল্লাহর সন্তোষ ও তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন অ-ফরয-সুন্নত বা নফল-আদায়



www.pathagar.com

করবে, তাকে এ জন্য অন্য সময়ের ফরয ইবাদতের সমান সওয়াব দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি এ মাসে ফরয আদায় করবে, সে অন্যান্য সময়ের সত্তরটি ফরয ইবাদতের সমান সওয়াব পাবে। এটা সবর, ধৈর্য ও তিতিক্ষার মাস। আর সবরের প্রতিফল হিসাবে আল্লাহর নিকট জান্নাত পাওয়া যাবে। এটা পরস্পর সহৃদয়তা ও সৌজন্য প্রদর্শনের মাস। এ মাসে মু'মিনের রেযেক প্রশস্ত করে দেয়া হয়। এ মাসে যে ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতার করাবে,তার ফলস্বরূপ তার গুণাহ মাফ করে দেয়া হবে ও জাহান্নাম থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেয়া হবে। আর তাকে আসল রোযাদারের সমান সওয়াব দেয়া হবে। কিন্তু সেজন্য আসল রোযাদারের সওয়াব কিছুমাত্র কম করা হবে না। আমরা নিবেদন করলাম, হে রসুল! আমাদের মধ্যে সকলেই রোযাদারকে ইফতার করাবার সামর্থ রাখে না। (এ সকল দরিদ্র ব্যক্তি এ সওয়াব কীভাবে পেতে পারে?) তখন রসুল করীম (স) বললেন, যে লোক রোযাদারকে একটি খেজুর, দুধ বা এক গন্ডুষ সাদা পানি দ্বারাও ইফতার করাবে, সে লোককেও আল্লাহতায়ালা এ সওয়াবই দান করবেন। আর যে লোক একজন রোযাদারকে পূর্ণ মাত্রায় পরিতৃপ্ত করবে, আল্লাহতায়ালা তাকে আমার 'হাওয' থেকে এমন পানীয় পান করাবেন, যার ফলে জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত সে কখনো পিপাসার্ত হবে না। এটা এমন এক মাস যে এর প্রথম দশটি রহমতের বারিধারায় পূর্ণ। দ্বিতীয় দশটি ক্ষমা ও মার্জনার জন্য এবং শেষ দশটি জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের উপায়রূপে নির্দিষ্ট। যে লোক এখানে নিজের অধীন লোকদের শ্রম-মেহনত হাল্কা বা হ্রাস করে দেবে, আল্লাহতায়ালা তাকে ক্ষমা করবেন এবং তাকে দোযখ থেকে নিষ্কৃতি ও মুক্তি দান করবেন।" (বায়হাকী-শুআবিল ঈমান)।

উপরোদ্ধৃত দীর্ঘ হাদীসটি রাসুলে করীম (স) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ। এখানে রোযা এবং রোযার মাস সম্পর্কে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ কিছু বক্তব্য রয়েছে যা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করা অত্যাবশ্যক। বিশ্ব-মুসলমানের জীবনে রমযান মাসের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। মাসটি তাদের প্রাত্যহিক জীবনধারা পরিবর্তন করে দেয় তাই নয়, মুসলমানদের মন-মানসিকতা, চরিত্র, আখলাক, সামাজিক চিন্তাধারা ইত্যাদি সবকিছুতে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত করে। তাই বিশ্ব-মুসলিমের কাছে এ মাসটির গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। আলোচ্য হাদীসটিতে এ মাসটিকে একটি বিরাট মর্যাদাবান মাস রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোরান মজীদেও এ মাসের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ج فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ـ

অর্থাৎ "রমযান মাস-এ মাসেই মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী রূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে রোযা রাখে।" (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৫)

www.pathagar.com

উপরোক্ত আয়াতে করীমে রমযান মাসে কুরআন মজীদ নাযিল হবার কথা বলা হয়েছে। শুধু কুরআন মজীদই নয়; অন্যান্য আসমানী কিতাবও এ পবিত্র মাসেই নাযিল হয়। রাসুলে করীম (ঃ) এর একটি হাদীসঃ

نَزَلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ وَالْإِنْجِيلُ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ وَالْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ -

অর্থাৎ "হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সহীফাসমূহ রমযান মাসের প্রথম রাত্রিতে নাযিল হয়েছে। তাওরাত কিতাব রমযানের ছয় তারিখ দিবাগত রাতে, ইনজীল রমযানের তের তারিখে এবং কুরআন শরীফ রমযানের চব্বিশ তারিখে নাযিল হয়েছে।"

পূর্বোদ্ধৃত দীর্ঘ হাদীসটিতে রমযান মাসের মযাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এ মাসে এমন একটি বরকত ও ফযীলতপূর্ণ রাত রয়েছে যা মাহাত্ম্য ও মর্যাদার দিক দিয়ে সহস্র মাস অপেক্ষাও উত্তম। এ অতি মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি 'কদর' রাত্রি হিসাবে অভিহিত। কোরআন মজীদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ -

অর্থাৎ "কদর (মহিমান্বিত) রাত্রি হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম।" (সূরা কদর, আয়াত–৩)

রমযান মাসের মর্যাদা প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত হাদীসে আরো বলা হয়েছে যে, এ মাসে আদায়কৃত সুন্নত–নফলকে ফরযের সমান ছওয়াব এবং এমাসের একটি ফরযকে অন্যান্য মাসের সত্তরটি ফরযের সমান ছওয়াব দেয়া হয়। এভাবে রমযান মাসের অতুলনীয় মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা দিয়ে এ মাসটিকে ধৈর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষার মাস হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ধৈর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষার বিনিময় হল পরম কাংক্ষিত জান্নাত। এর পর পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি ও সামাজিক সম্প্রীতি ও সমমর্মিতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ ইফতারের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। তার পর ইবাদত, বরকত ও নিয়ামত হিসাবে রমযান মাসকে তিন দশকে বিভক্ত করে প্রত্যেক দশকের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে হাদীসটিতে। এভাবে রমযানের ব্যাপক গুরুত্ব, মর্যাদা ও পরিচিতি ফুটে ওঠায় হাদীসটির তাৎপর্য উপলব্ধি করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত আবশ্যক।

অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা ও সমাজের দরিদ্র লোকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও রমযান অতুলনীয় নিয়ামত স্বরূপ। ইফতার ছাড়াও যাকাত ও ফেৎরা আদায় করার ব্যবস্থা এ মাসে রয়েছে। এ ব্যবস্থার দ্বারা অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা ও দরিদ্রের প্রতি বাস্তব আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শনের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

পুরা রমযান মাসই অতীব ফজিলত ও বরকতের। এ পুরো মাসটিকে রহমত, মাগফিরাত ও নাযাত–এ তিন ভাগে ভাগ করা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ফসলের জন্য কোন ভূমিকে প্রস্তুত করতে হলে বৃষ্টির অপেক্ষা করতে হয়। প্রথম পর্যায়ে বৃষ্টিস্নাত ভূমিকে



www.pathagar.com

উপযুক্তভাবে কর্ষণ করে বীজ বপন করতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে আগাছা-কুগাছা, পোকা-মাকড় এবং অন্যান্য উপদ্রব থেকে ফসলী জমিকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত পরিচর্যা প্রয়োজন হয়। অতঃপর তৃতীয় পর্যায়ে মনের পরিপূর্ণ আনন্দে সোনার ফসল কেটে এনে ঘরে তুলতে হয়। এভাবে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটা বিশেষ প্রক্রিয়া অতিক্রম করে উদ্দীষ্ট পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব। একবারেই চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়, কিংবা কোন একটা পর্যায়ে কোন রকম গাফলতি প্রদর্শন করলে সেজন্যও খেসারত দিতে হয়। যেমন যথাসময়ে জমি উপযুক্তরূপে কর্ষণ করে বীজ বপণ না করলে ফসলের কোন আশাই করা যেতে পারে না। দ্বিতীয় পর্যায়ে ফসলের উপযুক্ত পরিচর্যা না করলে এমনকি তৃতীয় পর্যায়ে যথাসময়ে যথাবিহিতভাবে ফসল কাটতে কোনরূপ ত্রুটি প্রদর্শন করলেও কাংক্ষিত ফলাফল আশা করা যায় না। তদ্রুপ রমযানের প্রথম দশকেও রোযা ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে কাতর-চিত্তে শুধু পরম করুণাময় রহমানুর রাহিম বিশ্ব-নিয়ন্তার অশেষ করুণাবারির আশায় একান্ত প্রার্থনা করা প্রয়োজন। মধ্যভাগে উপরোক্ত একই নিয়মে রোযা এবং অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীর সাথে নিজের কৃত জিন্দিগীর তাবত গুনাহ্‌খাতা মাফ করানোর জন্য রাব্বুল আলামীনের দরবারে বিগলিত চিত্তে দোয়া করা কর্তব্য। শেষ দশকে উপরোক্ত নিয়মের সাথে সাথে যাকাত, ফেতরা এবং অন্যান্য দান-খয়রাতের মাত্রা বৃদ্ধি করে পরম কাংক্ষিত নাযাত বা মুক্তির জন্য রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রাণ খুলে দোয়া করা কর্তব্য। মূলতঃ নাযাত বা জান্নাত লাভই মোমিন-জীবনের চরম লক্ষ্য। এ মহান লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য রোযা হলো সুনিশ্চিত সোপান। যাঁরা এভাবে সুস্পষ্ট লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে যথাযথ আত্ম-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিয়াম সাধনায় নিরত হন জীবনের চরম সার্থকতা অর্জনও তাঁদের জন্য সুনিশ্চিত। এঁদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই মহানবী (স) বলেনঃ

قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
(بخارى-مسلم)

"যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্ম-বিশ্লেষণের সাথে রমযানে রোযা ব্রত পালন করলো সে পূর্বকৃত গুণাহ্ মাফ করিয়ে নিল। যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্ম-বিশ্লেষণের সাথে রমযানের দীর্ঘ সালাত (নামায) আদায় করলো সে পূর্বকৃত গুণাহ মাফ করিয়ে নিল।" (বোখারী ও মুসলিম)।

তাকওয়ার গুণ অর্জনের মাস হিসাবে পুরো রমযান মাসটিই আমাদের কাছে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এ বরকতপূর্ণ মাসেই আল্লাহতায়ালা তাঁর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত আল্-কোরআন নাযিল করেছেন। এ জন্য রমযান মাস পবিত্র কোরআনের মাস হিসাবেও পরিচিত। আল্-কোরআন হলো সমগ্র মানব জাতির জন্য একমাত্র সঠিক হেদায়েত গ্রন্থ। তাই এ মহাগ্রন্থকে ধারণের জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি ও যোগ্যতা প্রয়োজন। রমযান মাস হলো সেই প্রস্তুতির সময় আর তাকওয়ার গুণ হলো সেই যোগ্যতা-যা না হলে কোরআনকে ধারণ, উপলব্ধি, অনুসরণ ও তার দ্বারা উদ্দীষ্ট ফল লাভ সম্ভব নয়। আল্-কোরআনের উপক্রমণিকায় এ মহাগ্রন্থের প্রণেতা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেনঃ


www.pathagar.com

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ - هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ -

"জা লিকাল্ কিতাবু লারাইবা ফিহ, হুদাল্লিল মুত্তাকীন।" অর্থাৎ এ কিতাবে (কোরআনে) কোনই সন্দেহ নেই, এটা মুত্তাক্বী (পরহেজগার) লোকদের জন্য সুস্পষ্ট হেদায়াত (সঠিক পথ-প্রদর্শনকারী)। মানব জাতির জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহতায়ালা অসংখ্য নিয়ামত রেখেছেন। তাঁর নিয়ামতের কোন শেষ নেই। তাঁর ক্ষুদ্রতম একটি নিয়ামত আমাদের জন্য অনেক বড়, বিকল্পহীন এবং তার বদলা দেয়ার ক্ষমতা আমাদের কারো নেই। কিন্তু আল্-কোরআনরূপ নিয়ামত তাঁর সীমা-সংখ্যাহীন নিয়ামতগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতমরূপে গণ্য হবার যোগ্য। কেননা এ অভ্রান্ত গাইডবুক যদি মানব জাতির কাছে না থাকতো তাহলে সীমাহীন দরিয়ার মাঝে দিগ-ভ্রান্ত নাবিকের মতই হতো আমাদের অবস্থা। আমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো। অবশ্য একথাও সত্য যে, মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্যও তাতে সফলকাম হতে পারতো না। তাই যে উদ্দেশ্যে আল্লাহতায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থকতায় মণ্ডিত করার জন্যই আল্-কোরআন নাযিল হয়েছে। অতএব, মানব সৃষ্টি, দুনিয়া ও আখেরাতে তার পরিণতি এবং কোরআন নাযিল এ দু'টি এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কে পরস্পর অন্বিত এবং এক অপরিসীম তাৎপর্যময় গুরুত্বের অধিকারী। আর সে জন্যই যে মাস বা মুহূর্তে এ মহাগ্রন্থ দুনিয়ায় নাযিল হয়েছে সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র রমযান মাসের একটি অতি মোবারক রজনীই আল্লাহ এ জন্য বেছে নিয়েছিলেন। 'কদর' বা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি হিসাবে আল্লাহ নিজেই এর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্-কোরআনের ভাষায় 'খায়রুম মিন আলফি শাহর'-অর্থাৎ এ রাত্রির মূল্য বা মর্যাদা হাজার মাসের চেয়েও অধিক। একটি বিশেষ রাত্রির অবয়বে সহস্র মাসের মহা ঔজ্জ্বল্যময় ক্ষণের অফুরন্ত দীপ্তি সুদক্ষ শিল্পীর মত রহস্যময় কুশলতায় আশ্চর্য সন্নিবেশিত। যেন সহস্র নুড়ির মধ্যে এক মহামূল্য হীরক খন্ড। এক রাত্রির ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম। এ গুরুত্ব কেন? বলাবাহুল্য একমাত্র কোরানুল করীমের জন্যই এ গুরুত্ব। যে কোরআন নাযিলের ক্ষণটি এত মর্যাদার অধিকারী সে কোরআনের মর্যাদা ও গুরুত্ব কতখানি তা একবার গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার।

আল্-কোরআন হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির জন্য এক পরিপূর্ণ হেদায়াত-গাইড বুক। আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতার মাধ্যমে মহানবী (স) এর কাছে ওহী হিসাবে এটি অবতীর্ণ। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় তথা বিশ্বনৈতিক জীবনের সকল দিক ও পর্যায়ের এক পরিপূর্ণ, নির্ভুল ও সর্বোত্তম গাইড লাইন এ আল্-কোরআন। একমাত্র এ গাইড লাইনের অনুসরণেই সামগ্রিক মানব-জীবনের সকল পর্যায়ে শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্য নির্ভরশীল। এ গাইড-লাইন ব্যতিরেকে অন্য কোন দর্শন, জ্ঞান ও প্রযুক্তিই যে পৃথিবীতে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম নয়, পৃথিবীর ইতিহাস আমাদের কাছে তা বার বার সুস্পষ্ট করে তুলেছে। তাই এ মহান আসমানী কিতাবকে ধারণ, উপলব্ধি ও সঠিকরূপে অনুসরণের জন্য এ রমযান মাসকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।



www.pathagar.com

কেননা এ মাসেই কঠোর সিয়াম-সাধনার দ্বারা মানুষ সেই মহত্তম গুণাবলী অর্থাৎ তাকওয়া অর্জনে সক্ষম হয়, যে তাকওয়ার গুণ ব্যতীত আল্-কোরআন বোঝা সম্ভব নয়।

মানবজাতিকে সুস্পষ্ট পথ-প্রদর্শন করেছে বলেই আল্-কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত আর সেজন্যই যে রাত্রিতে আল্-কোরআন নাযিল হয়েছে সে রাত্রির মর্যাদা এত অপরিসীম।

আল্-কোরআন যেমন মানবজাতির জন্য অভ্রান্ত, সুস্পষ্ট পথ-প্রদর্শক, এ মহা ঐশী গ্রন্থের প্রতি মানবজাতিরও তেমনি সুনির্দিষ্ট কতিপয় দায়িত্ব রয়েছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহর দ্বীন ও আল্লাহর কিতাব কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য নয়; তবে যেহেতু মুসলমানগণ আল্লাহর দ্বীন ও কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে সুতরাং এ দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে মুসলমানদেরকেই বিশেষভাবে সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে।

আল্-কোরআনের প্রতি আমাদের প্রধানতঃ তিনটি দায়িত্ব রয়েছে। প্রথমতঃ ছহি-শুদ্ধরূপে নিয়মিত তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্র কালামের অর্থ ও তাৎপর্য যথাযথ জানা ও উপলব্ধি করা। তৃতীয়তঃ কোরআনের আদেশ-নির্দেশ অনুযায়ী ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন, নীতি ও অনুশাসন গড়ে তোলা। কোরআন এমন একটি মোবারক গ্রন্থ যে শুধু এটা তেলাওয়াত করলেও ছওয়াব। আল্লাহর নবী বলেন, কালামুল্লাহর একটি শব্দ উচ্চারণ বা মনোযোগ সহকারে শুনলেও দশটি নেকি। আল্লাহর কালামের এরূপ মর্যাদা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আল-কোরআন তো শুধু শ্রবণের জন্যই অবতীর্ণ হয়নি। এটার দ্বারা হেদায়াত (পথ-প্রদর্শন) পেতে হলে অবশ্যই একে যথাযথভাবে অনুধাবন-উপলব্ধি করতে হবে। মূল আরবীতে এটা সম্ভব না হলে নির্ভরযোগ্য অনুবাদের সাহায্য নিয়ে হলেও অবশ্যই আল-কোরআন সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন ভাষায় একাধিক নির্ভরযোগ্য অনুবাদ গ্রন্থ এবং অসংখ্য হক্কানী মোফাচ্ছেরে কোরআন বিদ্যমান থাকায় অধুনা এ কাজ মোটেই কঠিন কিছু নয়। যে কোরআনের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য আল্লাহ স্বয়ং পয়গাম পাঠিয়েছেন, স্রষ্টার পাঠানো সে পয়গাম যথাযথ উপলব্ধি-অনুধাবনের জন্য আমাদের অবশ্যই একান্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিক ব্যাকুলতা থাকা প্রয়োজন। অতঃপর এর অর্থ অনুযায়ী আমল করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে কোরআনী বিধান মোতাবেক জিন্দেগী যাপনের উদ্দেশ্যেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আর কোরআন এমন একটি গ্রন্থ যাতে ব্যক্তিগত জীবন থেকে, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় তথা জীবন পরিচালনার যাবতীয় মূলনীতি সন্নিবেশিত। আর এই মূলনীতি এমন এক সত্তার নিকট থেকে প্রদত্ত যিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-সবকিছুর দ্রষ্টা, স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক এবং মানব-প্রকৃতি, মানব ও সৃষ্টিলোকের সবকিছুর চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। অতএব তাঁর দেয়া মূলনীতিই একমাত্র নিখুঁত ও সঠিক।

এত বড় নেয়ামতপূর্ণ গ্রন্থ ধারণের জন্য যেরূপ তাক্ওয়াপূর্ণ নির্মল আদর্শ চরিত্র দরকার রমযান সে ধরনের চরিত্রই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। তাই বিশেষভাবে রমযান মাসে বেশী বেশী কোরআন তেলাওয়াত, অধ্যয়ন-অনুশীলন ও এর অর্থ অনুধাবন করা আবশ্যক এবং সাথে সাথে কোরআনের দাবী অনুযায়ী ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা



www.pathagar.com

সমগ্র বিশ্বকে ঢেলে সাজানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো দরকার।

এটা কোন মামুলী কাজ নয়। এ কাজে ক্ষমতাদপী বাতেল পদে পদে বাধার উত্তুঙ্গ প্রাচীর তুলে ধরে। হিংস্র শ্বাপদেরা নখর বিস্তার করে মোমিনের দীপ্ত শিরকে ধূলায় বিলুণ্ঠিত করে দিতে চায়। এ বাঁধার পাহাড়কে ধূলিসাৎ করে দৃপ্তপদে এগিয়ে চলাই মোমিন-জীবনের চির দুর্জয় সাধনা। তাই মোমেনের জীবন হলো জেহাদী জীবন-নিরন্তর সংগ্রামে মুখর এক চলিষ্ণু সাহসী সত্তা। মোমেন-জীবনের সর্বোচ্চ সার্থকতা হলো জেহাদে আর তার চূড়ান্ত সাফল্য হলো শাহাদাতে।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে মোমেন এ জেহাদের জন্য নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখে। সর্বপ্রথম ও সর্বোচ্চ জেহাদ হলো নফস্ অর্থাৎ স্বীয় প্রবৃত্তির সাথে। সকল প্রকার বাতিল চিন্তা-ভাবনা, শয়তানী ওয়াছওয়াছা, অসৎ কর্মকান্ড, অসংগত লোভ-লালসা ও পার্থিব স্বার্থপরতা থেকে নিজেকে সংযত করে তাকওয়ার পবিত্র গুণে নিজেকে গুণান্বিত করার সর্বাত্মক, সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টার নামই হলো নফসের সাথে জেহাদ। এটাই হলো সর্বোচ্চ জেহাদ। কেননা এটাই হলো জেহাদের প্রথম এবং সবচেয়ে কঠিনতম পর্যায়। এর পর পর্যায়ক্রমে আসে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায়। এসকল ক্ষেত্রে বাতিলকে পরাভূত করে আল্লাহ্র হুকুমত তথা কোরআন-সুন্নাহ্র অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত করার সার্বক্ষণিক সর্বাত্মক প্রচেষ্টাই হলো মোমিন-জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। কোরআনের পরিভাষায় এটাই হলো জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ-অর্থাৎ আল্লাহর পথে জেহাদ।

আল্লাহ বার বার মোমিনদেরকে জেহাদের তাগিদ দিয়েছেন। অতএব জেহাদ আমাদের জন্য ফরয। এ জেহাদে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করার জন্য রমযান হলো সর্বোত্তম ট্রেনিং-এর মাস। এ মাস আমাদেরকে নিজ প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করার জন্য যেমন অনুপ্রেরণা ও বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয় তেমনি কাফেরের মোকাবিলায় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলামকে বিজয়ী শক্তিরূপে পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখারও অনুপ্রেরণা দান করে। জঙ্গে বদর হলো তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাই রমযান একদিকে যেমন কোরআন নাযিল হবার মাস হিসাবে পরিচিত, অন্যদিকে তেমনি জেহাদের মাস হিসাবেও খ্যাত।

এভাবে রোযা আমাদের পুরা জীবনকেই উদ্বোধিত করে সত্য, ন্যায়, সুন্দর ও কল্যাণের কাজে। রোযা আমাদের মধ্যে ধৈর্য, সংযম, সহমর্মিতা ও তাক্বওয়ার অনন্যতুল্য গুণ সৃষ্টি করে-যা পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তির চাবিকাঠি। রমযান কোরআনের মাস, রমযান জেহাদের মাস। তাই রমযানের মর্যাদা রক্ষা এবং পরিপূর্ণ আত্মবিশ্লেষণ ও দীপ্ত উপলব্ধির সাথে রমযানের রোযা রাখা আমাদের কর্তব্য এবং এ থেকে যথার্থ ফায়দা হাসিলের আপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যক।

পবিত্র রমযান মাস অতিক্রান্ত হবার পর শাওয়ালের পয়লা তারিখে আনন্দের সওগাত নিয়ে আসে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর। ঈদ অর্থ আনন্দ। এ আনন্দ তারই, যে পরমার্থের সন্ধান পেয়েছে। দীর্ঘ একমাস ধরে তাক্ওয়া অর্জনের যে কঠোর সংগ্রাম-সাধনা চলে তা হাসিলের পরেই ঈদের আনন্দ মুমিনের চিত্তকে পরম তৃপ্তি ও মাধুর্যে আপ্লুত করে তোলে।



www.pathagar.com

এ আনন্দ সকৃতজ্ঞ হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। কিন্তু যারা এ তাক্ওয়া অর্জনের মত মহাসাফল্য থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য এ দিন হলো অ-ঈদ অর্থাৎ নিরানন্দের। তাই ইসলামের মহান দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এক ঈদের দিন প্রত্যুষে সীমাহীন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। ঈদের নামায পড়তে যেতে তাঁর দেরী দেখে অন্যরা তাঁর কাছে ছুটে এসে তাঁকে ক্রন্দনরত দেখতে পেলো। সবাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো, ঈদের আনন্দের দিনে আপনি আজ কান্না করছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, "আল্লাহর দরবারে আমার রোযা কবুল হয়েছে কিনা, রোযা রাখার উদ্দেশ্য আমার দ্বারা পূর্ণ হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই, তাই আমার আতংক-সংকুল চিত্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে।" এটাই হলো সত্যিকার মু'মিনের অনুভূতি।

এ অনুভূতির কারণেই মুমিনের ঈদও বল্গাহীন আনন্দের বহিঃপ্রকাশ নয়। সে সর্বাবস্থায় আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসাবে আল্লাহর শোকর গোজার করে থাকে। ঈদের নামাযেও তারই প্রদর্শনী হয়। বৃহৎ উন্মুক্ত প্রান্তরে সমাজের সকল স্তরের মুসলমান একত্র হয়ে কৃতজ্ঞতায় মস্তক অবনত করে আল্লাহর অশেষ রহমত ও নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে। বেহেশতী আনন্দে উদ্বেল সে এক অপরূপ দৃশ্য। ঈদের আনন্দ তাই নিছক প্রবৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের বেপরোয়া প্রকাশ নয়, মুমিনের সকৃতজ্ঞ চিত্তের স্বর্গীয় অমিয়ধারা। সে ধারায় স্নাত হয়ে উদ্ভাসিত হয় এক কল্যাণময়, শান্তিপূর্ণ সমাজের সমুজ্জল মুখাবয়ব।

ঈদের উৎসবও তাই ইসলামে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। প্রত্যেক জাতির জীবনেই উৎসব-আনন্দের জন্য কতিপয় দিন নির্দিষ্ট রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য জাতির উৎসব-আনন্দ থেকে ইসলামের এ উৎসব মৌলিকভাবেই স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ

**এক,**-প্রত্যেক উৎসবেরই একটা ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ও তাৎপর্য বিদ্যমান। বিশেষ জাতির ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দিন, যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনা, দেশ-নায়কদের জন্ম-মৃত্যু, ঋতুর আবর্তন ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে সে জাতির উৎসবের দিন নির্ধারিত হয়। কিন্তু ইসলামে এসব বিষয়ের কোন গুরুত্ব নেই। ইসলামী উৎসবের মূল চেতনা হলো বিশ্বস্রষ্টার প্রতি বান্দার সকৃতজ্ঞ চিত্তের নিঃশেষ আত্মসমর্পণ। এরই ভিত্তিতে দুই ঈদ ইসলামে উৎসবের দিন হিসাবে নির্ধারিত।

**দুই.**-ঈদুল ফিতরে একদিকে যেমন জামাতবদ্ধ হয়ে শোকরানা নামায পড়া হয়, অন্যদিকে আবার সমাজের দরিদ্র-নিঃস্ব মানুষের মধ্যে সাদাকাতুল ফিৎরা বিতরণ করে তাদেরকে সমভাবে ঈদের আনন্দে শরীক হবার সুযোগ দেয়া হয়। এছাড়া, ঈদুল-আযহাতে হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর চরম আত্মত্যাগের ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে কোরবানী বা নিজের পশু-প্রবৃত্তিকে বিনাশ করার যে শিক্ষা, তার মাধ্যমেও একদিকে চিত্ত-শুদ্ধির ব্যবস্থা রয়েছে, অন্যদিকে কোরবানীর পশুর গোশত একসঙ্গে সমাজের সবার সাথে বন্টন করে খাওয়ার মধ্যে সামাজিক ঐক্যবোধ ও সমমর্মিতার প্রকাশ ঘটে। এভাবে ঈদের আনন্দকে সমাজের সকলের মধ্যে বন্টন করে দেয়াই ইসলামের রীতি।



www.pathagar.com

তিন,–অন্যান্য জাতির আনন্দ–উৎসবে যেমন উদ্দামতা, বল্গাহীনতা ও পশু–প্রবৃত্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, সেক্ষেত্রে ইসলামে রয়েছে শালীনতা, পবিত্রতা ও উদার মানবিকতারবহিঃপ্রকাশ।

চার,–ইসলামী উৎসবে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ভাল পোশাক, সুগন্ধি, মহিলাদের জন্য অলংকারাদি ইত্যাদি পরিধান জায়েয। কিন্তু সর্বাবস্থায় চাকচিক্য, জৌলুস ও আত্মম্ভরিতা, প্রদর্শনেচ্ছাইত্যাদিপরিহার্য।

পাঁচ,–ইসলামী উৎসব মুসলিম মিল্লাতের বৃহত্তর ঐক্য ও উজ্জ্বল মর্যাদাবোধের প্রতীক। এদিনে মুসলমানগণ একদিকে যেমন সকৃতজ্ঞচিত্তে মহান রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করে অন্যদিকে তেমনি হৃষ্টচিত্তে ধনী–দরিদ্র, বর্ণ–গোত্র নির্বিশেষে পরস্পর বুকে বুক মিলিয়ে গভীর ভ্রাতৃত্ব–বন্ধনের সুউজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

## হজ্ব

ইসলামের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো হজ্ব। রমযান মাসে কঠোর সিয়াম–সাধনার মাধ্যমে যে খোদাভীরু, তাক্ওয়াসম্পন্ন মানুষ গড়ে উঠলো হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সে মানুষই বিভিন্ন এলাকা থেকে দুনিয়ার প্রাণ–কেন্দ্র পবিত্র মক্কা–মুয়ায্যমায় এসে সমবেত হয়। প্রকৃতপক্ষে রমযান মাসেই হজ্ব আদায়কারী ব্যক্তি হজ্বের পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে থাকে। রমযানে রোযার দ্বারা অর্জিত তাক্ওয়া–পরহেজগারী, আমল–আখলাক, ত্যাগ–তিতিক্ষা ও দেহ–মনের সার্বিক প্রস্তুতি হজ্ব পালনকারীর জন্য একান্ত আবশ্যক রূপে বিবেচিত হয়। হজ্ব ও উমরা এবং কুরবানী সম্পর্কে কোরআন শরীফে অনেকগুলো আয়াত রয়েছে। কতিপয় আয়াত এখানে উদ্ধৃত হলোঃ

وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ-

অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্ব ও কুরবানী পূর্ণ কর।" (সূরা বাকারা, আয়াত–১৯৬)।

উপরে একটি দীর্ঘ আয়াতের আংশিক উদ্ধৃত হয়েছে। উদ্ধৃত অংশে হজ্ব এবং কুরবানী একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে। এ ক্ষুদ্র বাক্যটি গভীর তাৎপর্য বহন করে। হজ্ব এবং কুরবানী দুনিয়ার কোন স্বার্থ, লোভ–লালসা, মর্যাদা ও খ্যাতি লাভের মনোভাব নিয়ে করলে আল্লাহর নিকট তা কবুল হবে না। এ আয়াতাংশের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে হজ্ব ও কুরবানী সম্পন্নকারীদের অবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকেরই আত্ম–বিশ্লেষণের দ্বারা ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যাতে আমরা সঠিকভাবে পালন করে আল্লাহর কাছে তার উপযুক্ত প্রতিফল পেতে পারি সে ব্যাপারে সচেতন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। উদ্ধৃত আয়াতের পরবর্তী অংশে হজ্ব, উমরা ও কুরবানী সম্পন্ন করার বিধি–বিধান বিস্তারিতভাবে আল্লাহতায়ালা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ বলেনঃ



www.pathagar.com

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ج فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ـ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ـ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ـ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ٥

অর্থাৎ "হজ্ব হয় সুবিদিত মাসে। অতঃপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্ব করা স্থির করে, তার জন্য হজ্বের সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু কর আল্লাহ তা জানেন। এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তোমরা আমাকে ভয় কর।" (সুরা বাকারা, আয়াত-১৯৭)

উমরা সারা বছর ধরেই পালন করা যায়, এমনকি হজ্বের সময়েও। কিন্তু হজ্ব কেবল বছরের নির্দিষ্ট একটি মাসে, নির্দিষ্ট দিন বা দিনসমূহেই সম্পন্ন করার বিধান দেয়া হয়েছে। এ হজ্ব উপলক্ষে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও আত্ম-সংযমের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হয়। রমযানে রোযার দ্বারাই এ গুণগুলো আয়ত্ত হয়। কিন্তু রোযা ও হজ্বের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য এই যে, রোযা সাধারণতঃ আমরা নিজ গৃহে অনেকটা আরাম ও আয়েশের মধ্যেই পালন করে থাকি। কিন্তু হজ্বের জন্য সফরের ক্লেশ, বিবিধ অজানা, অদেখা, অপ্রত্যাশিত অবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এমতাবস্থায়, একমাত্র আল্লাহর স্মরণ ও পবিত্র স্থানসমূহের ইজ্জত ও আপন মহৎ লক্ষ্যের কথা চিন্তা করে আত্ম-সংযমের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা আবশ্যক। উক্ত একই সুরার ১৯৮ নং থেকে ২০৩ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহতায়ালা হজ্বের উদ্দেশ্য এবং তা কীভাবে পালন করা বিধেয়, কোন্ স্থানের কী গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

এরপর আল্লাহ বলেনঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ٥ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ج وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ط وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ط وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থাৎ "মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয় তা তো বাক্কায় (মক্কার অপর নাম) এটা বরকতময় ও বিশ্ব-জগতে দিশারী। এতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, (যেমন) মাকামে ইবরাহীম, এবং যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্ব করা তার অবশ্য কর্তব্য।



www.pathagar.com

এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ বিশ্ব-জগতের মুখাপেক্ষী নন।" (সূরা আল-ইমরান, আয়াত ৯৬ ও ৯৭)।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কা'বা গৃহের মর্যাদা, গুরুত্ব ও তার ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, মানবজাতির সর্বপ্রথম ইবাদতগাহ্ হিসাবে কা'বা শরীফ নির্মিত হয়। আদি মানব হযরত আদম (আ) কর্তৃক এটা প্রথম নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে হযরত নূহ (আ) এর মহাপ্লাবনে এটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে আল্লাহতায়ালার নির্দেশে মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তদ্বীয় পুত্র হযরত ঈসমাইল (আ) এ পবিত্র গৃহ পূর্বস্থানে যথাযথরূপে পুর্ননির্মাণ করেন। মাকামে ইবরাহীম সেই পবিত্র স্মৃতির স্মারক হিসাবে আজো কা'বাগৃহের সামনে বিদ্যমান। এ ছাড়া, পবিত্র কা'বা অতি বরকতময় ও মর্যাদার প্রতীক-এ কথা উল্লেখ করে আল্লাহ এ পবিত্রগৃহকে বিশ্ব-জগতের দিশারী বলে অভিহিত করে প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে এখানে এসে হজ্বব্রত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এখানে 'বিশ্ব-জগতে দিশারী' কথাটি অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচার করলে কা'বা বা মক্কা নগরী পৃথিবীর হৃৎপিন্ড হিসাবে বিবেচিত হবার যোগ্য। দ্বিতীয়তঃ আদি মানব হযরত আদম (আ) ও হযরত হাওয়া (আ) এ পবিত্র স্থানেই বেহেশত থেকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মানবজাতির আদি ও প্রাচীনতম লীলা-ক্ষেত্র হিসাবে তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম। তৃতীয়তঃ কা'বা পৃথিবীর প্রাচীনতম ইবাদতগাহ। পৃথিবীর উপর সাত তলা আসমানের শেষ প্রান্তে বায়তুল মামুর অবস্থিত, যেখানে অগণিত ফেরেশতা সদা-সর্বদা আল্লাহতায়ালার ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল রয়েছেন, সেই পবিত্র বায়তুল মামুরের ছায়ার নীচেই কা'বার অবস্থান। চতুর্থতঃ যুগে যুগে যত নবী-রসুল পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁরা সকলেই পবিত্র কা'বা তওয়াফ করেছেন। পঞ্চমতঃ আখেরী নবী হযরত মুহম্মদ (স) পবিত্র কা'বা তওয়াফ করেছেন এবং সাহাবাদের নিয়ে হজ্বব্রত সমাপন করেছেন। এছাড়া, কা'বার মর্যাদা ও গুরুত্ব হয়ত আরো অনেক রয়েছে, যে সম্পর্কে আল্লাহতায়ালাই ভাল জানেন। কা'বার পবিত্রতা ও মর্যাদা সম্পর্কে কোরান শরীফ থেকে আর একটি উদ্ধৃতিঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ

অর্থাৎ "ওরা কি দেখে না আমি হারমকে (কাবা শরীফের চতুষ্পার্শ্বস্থ নির্ধারিত এলাকাকে 'হারম্' বলা হয়) নিরাপদ স্থান করেছি অথচ এর (বাইরে) চতুষ্পার্শ্বে যেসব মানুষ আছে, তাদের উপর হামলা করা হয়, তবে কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?" (সূরা আনকাবুত, আয়াত-৬৭)

জাহেলী যুগে কাফির-মুশরিকগণও কা'বার এ পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষা করে চলতো।



www.pathagar.com

আপন পিতৃ-হন্তাকেও হারমের মধ্যে দেখলে প্রতিশোধ নেয়ার কথা চিন্তা করতো না। পৃথিবীর এ বরকতময় পবিত্রতম স্থানে মুসলমানরা প্রতি বছর হজ্বব্রত পালনের মাধ্যমে নিজেকে যেমন পূত-পবিত্র-পরিশুদ্ধ করে, সামগ্রিকভাবে বিশ্ব-মুসলমানের কল্যাণ-চিন্তা, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সমমর্মিতা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সর্বোপরি সারা পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার, প্রসার ও বিজয়কে সুনিশ্চিত করার জন্যও তেমনি সম্মিলিত পরামর্শ গ্রহণ ও কর্ম-পদ্ধতি গ্রহণের সুযোগ পায়। মহানবী (স) হজ্ব উদযাপন উপলক্ষে আরাফাতের ময়দানে যে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ পেশ করেছিলেন, তা শুধু উপস্থিত মুসলমানদের জন্যই নয়; উপস্থিত-অনুপস্থিত-অনাগত সকল মুসলমান তথা সমগ্র মানবজাতির জন্য দিক-দিশারী স্বরূপ ও অপরিসীম গুরুত্ববহ এক মহামূল্যবান চিরন্তন দলিল। আরাফতের ময়দানে আজো সেই একই স্থানে দাঁড়িয়ে খোতবা পেশ করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। বিভিন্ন দেশের মুসলিম মনীষীগণ আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসা অনুযায়ী মুসলিম জাতির দিক-নির্দেশিকামূলক ভাষণ দিয়ে থাকেন। হজ্বের এ একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

হযরত ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক কা'বা পুর্ননির্মাণ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ.

অর্থাৎ "এবং স্মরণ কর যখন আমি ইব্রাহিমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান, তখন বলেছিলাম আমার সাথে কোন শরীক স্থির করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাদের জন্য যারা তওয়াফ করে এবং যারা দাঁড়ায় (নামায), রুকু করে ও সিজদা করে। এবং মানুষের নিকট হজ্ব-এর ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটসমূহের পিঠে, এরা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে, যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হতে পারে।" (সূরা হজ্ব, আয়াত, ২৬-২৮)

এরপর আল্লাহ আরো বলেনঃ

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ.

অর্থাৎ "অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ



www.pathagar.com

করে এবং তওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের। এটাই বিধান এবং কেউ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানাদির সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম।" (সূরা হজ্ব, আয়াত–২৯ ও ৩০)।

কাবাগৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হলে আল্লাহতায়ালা হযরত ইব্রাহিম (আ) কে সেখানে হজ্বের আযান প্রদানের নির্দেশ দেন। সে আযানে সাড়া দিয়েই মুসলিম মিল্লাতের লোকেরা দেশ–দেশান্তর হতে যুগ যুগ ধরে হজ্ব ব্রত পালন করে আসছে। এখানে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর এ পবিত্র গৃহ একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্যই নির্দিষ্ট, নিকট ও দূর থেকে আগত আল্লাহর বান্দারা এ পবিত্র গৃহ তওয়াফ করবে, এখানে নামায পড়বে এবং মহিমা ও একত্ববাদ ঘোষণা করবে। পূত–পবিত্র দেহ–মন নিয়ে এখানে এসে যারা হজ্বের নির্দিষ্ট বিধানাদি পালন করে আল্লাহর নিকট রয়েছে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার।

এরপর কুরবানী সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেনঃ

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ ـ

অর্থাৎ "আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।" (সূরা হজ্ব, আয়াত–৩৪)।

এবারে হজ্ব সম্পর্কে কতিপয় মশহুর হাদীস–এর উল্লেখ করতে চাই। এখানে উদ্ধৃত প্রথম হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা (রা)। তিনি বলেনঃ

سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقُوْلُ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَّلَدَتْهُ أُمُّهُ ـ

অর্থাৎ "আমি নবী করীম (স) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহরই জন্য হজ্ব করল এবং এ সময়ের মধ্যে স্ত্রী সহবাস এবং কোনরূপ ফাসেকী কাজ করল না, সে তার মা কর্তৃক ভূমিষ্ট হওয়ার দিনের মতই হয়ে গেল।"

দ্বিতীয় হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তিনি বলেছেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ (رض) فَقَالَ أَفِيْ كُلِّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَوْ قُلْتُهَا نَعَمْ لَوَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوْا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيْعُوْا

www.pathagar.com

وَالْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ۔

অর্থাৎ "হযরত নবী করীম (স) বলেনঃ হে লোকগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা তোমাদের প্রতি হজ্ব ফরয করেছেন। তখন আক্‌রা ইবনে হাবিস দাঁড়িয়ে বললেন, হে রাসুল (স) প্রত্যেক বছরই কি হজ্ব করা ফরয?— নবী করীম (স) বললেন, আমি যদি এর জবাবে 'হ্যাঁ' বলি, তবে তাই ওয়াজিব হয়ে যাবে, আর যদি তা ওয়াজিব হয়ে যেত, তবে তোমরা সে অনুযায়ী আমল করতে না। আর তোমাদের জন্য সেটা করা সম্ভবও নয়। হজ্ব মূলতঃ একবারই ফরয, যদি কেউ এর অধিক করে, তবে তা নফল।" (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী, দারেমী)।

তৃতীয় হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তিনি বলেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ اِلَّا الْجَنَّةُ (ترمذى۔ابوداؤد)

অর্থাৎ "হযরত রাসুলে করীম (স) বলেছেন, তোমরা হজ্ব ও উমরা পরপর সঙ্গে সঙ্গে আদায় কর। কেননা এ দুটি কাজ দারিদ্র ও গুণাহখাতা নিশ্চিহ্ন করে দেয়, যেমন রেত লোহার মরিচা ও সোনা–রূপার জঞ্জাল দূর করে দেয়। আর কবুল হওয়া হজ্বের ছওয়াব জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।"

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, হজ্ব সমর্থ ব্যক্তির (পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ই) জন্য ফরয। প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ করে হজ্ব আদায় করলে অর্থাৎ মকবুল হজ্বের একমাত্র প্রতিদান হলো জান্নাত। এথেকে আরো জানা যায়, হজ্ব এবং উমরা একই সাথে করা বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ হজ্বের আগে অথবা পরে কিংবা উভয় ক্ষেত্রেই উমরা পালন অতিরিক্ত ছওয়াব। অনুরূপ আরো বহুসংখ্যক হাদীস রয়েছে। মূল বিষয় অনুধাবনের জন্য উপরোক্ত তিনটি মশহুর হাদীসই যথেষ্ট মনে করে অধিক উদ্ধৃতি দানে বিরত থাকলাম।

ইতোপূর্বে ইবাদতের যে তিনটি মূল স্তম্ভের কথা বলা হয়েছে তা এককভাবে কোন এক ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট একটি সমাজ–কেন্দ্রিক। কিন্তু হজ্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বজনীন। বিশ্বের সব দেশ, ভাষা, গোত্র ও বর্ণের সমর্থ মুসলমান নর–নারী এক স্রষ্টার উদ্দেশ্যে একটি মাত্র কেন্দ্রের দিকে একই সময়ে একটি মাত্র পবিত্র আশার উজ্জ্বল দীপ–শিখা জ্বালিয়ে সমবেত হয় আল্লাহর ঘরে। সে অগণিত মানুষের ব্যাকুল চিত্তের একটি মাত্র আওয়াজে মুখরিত হয় হেরেম শরীফের চতুর্দিকঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা। লাব্বাইকা লা–শারিকালাকা, লাব্বাইকা। ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্নিয়ামাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা–শারিকালাকা।" অর্থাৎ তোমার ডাকেই হাজির হয়েছি, হে আল্লাহ! আমি এসেছি, তোমার কোন শরীক নেই, আমি তোমারই নিকট এসেছি। সকল তারীফ–প্রশংসা একমাত্র



www.pathagar.com

তোমারই জন্য, সব নেয়ামত তোমারই দান, রাজত্ব আর প্রভুত্ব সবই তোমার। তুমি একক–কেউ তোমার শরীক নেই।

বিশ্বের কেন্দ্র–ভূমে রাষ্ট্র–গোত্র, ভাষা–বর্ণ নির্বিশেষে তৌহিদবাদের এই যে সবল–সুস্পষ্ট ঘোষণা, স্রষ্টা ও বান্দার সম্পর্কের এই যে নিঃসকোচ আবেগাকুল উচ্চারণ এবং এর ফলে মানবজাতির এক ও নির্বিশেষ ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সত্তার সর্বজনীন প্রকাশ–এর তাৎপর্য সীমাহীন ও অতুলনীয়। ইসলামের এ আন্তর্জাতিকতার অন্যতম উদ্দেশ্য হলোঃ প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে মিল্লাতে ইসলামিয়ার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিগণ একত্র হয়ে মিল্লাতের সকল সমস্যা, উন্নতি–অগ্রগতি আলোচনা–পর্যালোচনাপূর্বক পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরামর্শের ভিত্তিতে পরবর্তী এক বছরের জন্য ইসলামকে বিজয়ী শক্তিরূপে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তথা আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর যমীনে কায়েম করার যে দায়িত্ব মুমিনদের উপর অর্পিত হয়েছে তা পূর্ণরূপে আন্‌জাম দেয়ার জন্য উপযুক্ত কার্যকরী কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পথ–নির্দেশ দান করা।

এ উদ্দেশ্য ও অনুভূতিকে সামনে রেখে হজ্বব্রত উদ্‌যাপন করলে একদিকে যেমন ব্যক্তিগতভাবে নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ হওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি মিল্লাতে ইসলামিয়ার ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক দৃঢ় ও অটুট হওয়ার সাথে সাথে সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কার্যকরী কর্মসূচী প্রণয়ন সহজ হয়।

হজ্বের দুটো দিকই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ–একটি ব্যক্তিগত ও আরেকটি আন্তর্জাতিক বা সার্বজনীক। দুটি দিকই গভীরভাবে বিবেচনাযোগ্য। ইতোপূর্বে আমরা ইবাদতের যে তিনটি মূল বুনিয়াদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি সেগুলো নিজের ঘরে বসে, দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবন–যাত্রা সম্পূর্ণ অব্যাহত রেখে আদায় করা সম্ভব। কিন্তু হজ্ব হলো তার ব্যতিক্রম। হজ্বের উদ্দেশ্যে নিজের ঘর–সংসার, সাংসারিক, জাগতিক সমস্ত কাজ এবং আত্মীয়–স্বজন, প্রতিবেশী সবকিছু পরিত্যাগ করতে হয়। সারা জীবন ধরে নিজের শ্রমার্জিত অর্থে যে আরামের আশ্রয় গড়ে তোলা হয়, আনন্দ–ভালবাসা, স্নেহ–মমতায় স্ত্রী–পুত্র–কন্যা–নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে যে অচ্ছেদ্য নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, একমাত্র আল্লাহর মহব্বতে সে সবকিছুর মায়া–বন্ধন ছিন্ন করে 'লাব্বায়েক' অর্থাৎ আমি আমার মহান প্রভুর সমীপে হাজির বলে বেরিয়ে পড়তে হয়। দীর্ঘ পথের ক্লান্তি, সফরের সীমাহীন তকলিফ সহ্য করে আল্লাহর ঘরে উপনীত হতে হয়। সেখানে আরেক দৃশ্য। ধনী–দরিদ্র, আমীর–নফর সকলের পরণে মাত্র দুই ফর্দ শ্বেতশুভ্র অকাট সেলাইবিহীন পোষাক। জীবন–সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে, আপনজনদেরকে শোক–সাগরে ভাসিয়ে মানুষ যে অবস্থায় পরকালের পথে যাত্রা করে, ঠিক সেই একই অবস্থায় সমবেত হতে হয় কা'বার ঘরে, মিনা ও আরাফাতের ঐতিহাসিক ময়দানে। সে অবস্থায় ব্যক্তির মনে যে ভাবান্তর ঘটে তা কেবল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারাই উপলব্ধি করা সম্ভব। এভাবে হজ্বব্রত সমাপন করে রসুলে পাক (স)–এর পবিত্র রওজা মোবারক যিয়ারত করে যখন কেউ ঘরে ফিরে আসে, তখন তার অবস্থা সদ্যজাত একজন মাসুম (নিষ্পাপ) শিশুর মতই হয়। দুনিয়ার লোভ–লালসা, স্বার্থপরতা,



www.pathagar.com

আবিলতা তাকে স্পর্শ করার কথা নয়। এভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে হজ্বের দ্বারা যে চারিত্রিক উৎকর্ষ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে, মানুষকে আশরাফুল মখলুকাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য তার চেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা আর কিছুই কল্পনা করা যেতে পারে না।

এবারে আন্তর্জাতিক বা সার্বজনীক বিষয়টির কথা আলোচনা করা যাক। এহ্‌রাম বেঁধে, 'লাব্বায়েক' বলে যখন মানুষ চতুর্দিক থেকে ছুটে আসে এবং আল্লাহর ঘর পবিত্র কা'বা তওয়াফ করতে থাকে তখন সেখানে গোত্র-বর্ণ, স্থান-ভাষা, ধনী-দরিদ্র, আমির-মিসকিন সব ভেদাভেদ লোপ হয়ে যায়। যে আল্লাহ্ আসমান-যমীন, জ্বীন-ইনসান সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি আমাদের ইহকাল ও পরকালের একমাত্র প্রভু তাঁর কাছে হাজির হবার সময় দুনিয়ায় প্রচলিত, মানুষের গড়া কৃত্রিম ভেদাভেদের কোনই দাম নেই। এমন অকৃত্রিম সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবোধের বিকাশ পৃথিবীতে আর কোনভাবেই হতে পারে না।

মিনা এবং আরাফাতে সেই একই দৃশ্য। কিন্তু এখানকার উপলব্ধি কিছুটা ভিন্নরূপ। মিনার ময়দানে যেখানে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর প্রাণাধিক পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে আল্লাহর নির্দেশে কোরবানী করতে উদ্যত হয়েছিলেন এবং কিশোর বালক-ইসমাইল (আ) আল্লাহ্‌র হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে স্নেহ-বৎসল পিতার উদ্যত ছুরির সামনে হাসিমুখে স্বীয় স্কন্ধ পেতে দিয়েছিলেন, সে মহান আত্মত্যাগের ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত পুণ্য-ভূমিতে সর্বকালীন মানুষের জন্য যে শিক্ষা ও আদর্শ বিদ্যমান তা চোখের সামনে জাজ্জ্বল্যমান হয়ে ফুটে ওঠে। সে ঐতিহাসিক আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেই হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর সুন্নাত হিসাবে সেখানে কোরবানীর অনুষ্ঠান করতে হয়। এ মিনার ময়দানেই শয়তানের বুকে বার বার পাথর নিক্ষেপ করে নফ্‌সের সমস্ত শয়তানী ওয়াস্‌ওয়াসা থেকে নিজকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিষ্পাপ করতে হয়।

আরাফাতের ময়দান আর এক ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত মহান পুণ্যভূমি। প্রথম মানব-মানবী, বেহেশত-চ্যুত হযরত আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ) দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে পৃথিবীর এক কোণে এ আরাফাতের ময়দানেই প্রথম মিলিত হয়েছিলেন এবং অনুতপ্ত-চিত্তে, অশ্রুসিক্ত প্রার্থনায় এখানেই তাঁদের কৃত গুণাহ-খাতা মাফ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই মহা-মুক্তির ময়দানে হযরত আদম-হাওয়ার (আ) উত্তর পুরুষেরা আজো মহান স্রষ্টার কাছে সজল-নয়নে, আবেগাপ্লুত চিত্তে প্রার্থনায় রত হয়। এ আরাফাতের ময়দানেই পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে বিশ্ব-মানবতার মুক্তিদূত, মানবতার সুউজ্জ্বল আদর্শ সরওয়ারে কায়েনাত, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) সুউচ্চ কণ্ঠে বিশ্ব-মানবের কাছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়াতের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। যে ঐতিহাসিক বাণী সর্বকালের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা রূপে পরিগণিত। একদিকে তা যেমন সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, কল্যাণ ও শান্তির পয়গামবাহী, অন্যদিকে তেমনি খোদা-ভীতি, হক-পরস্তি ও জীবনের সঠিক দিশারী হিসাবে এ বাণী এক ঐতিহাসিক দলিলরূপে চিহ্নিত। আরাফাত-পাহাড়ের গাত্রে খোদিত স্মৃতি ফলকের দিকে (যেখানে দাঁড়িয়ে মহানবী (স) ভাষণ দিয়েছিলেন।) তাকালে সেই মহাবিপ্লবীর কণ্ঠ যেন আজো শুনতে পাওয়া যায়।



www.pathagar.com

এ ছাড়া মক্কা-মদীনার অসংখ্য ঐতিহাসিক ও মহানবী (স) এবং প্রিয় সাহাবায়ে কেরামদের (রা) পূত স্মৃতি-বিজড়িত স্থানসমূহ যিয়ারত করার সময় ইসলামের সংগ্রাম-যুগের সমস্ত ঘটনা তথা মানব-ইতিহাসের আদি অর্থাৎ হযরত আদম (আ) থেকে মহানবী পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ও কাহিনীই যেন জীবন্ত হয়ে ভেসে ওঠে। বিশ্ব তথা মানবজাতির ইতিহাসের যেন এ একটা বিস্তীর্ণ, খোলা মিউজিয়াম। যাদুঘরে যেমন বিভিন্ন প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্ন সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়, এসব পবিত্র স্থানসমূহেও যেন তেমনি এক কুদরতি কৌশলে হযরত আদম (আ) থেকে মহানবী (স) পর্যন্ত বিশ্বের এক সুদীর্ঘ ইতিহাসকে সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। হজ্বব্রত পালন করলে তাই মোটামুটি বিশ্বের ইতিহাসটাও জানা হয়ে যায় এবং সেই সাথে আরো জানা যায়,শয়তানের প্ররোচনায় হযরত আদম-হাওয়ার (আ) কী পরিণতি হয়েছিল, হযরত ইব্রাহিম-ইসমাইল (আ)-কে শয়তান কীভাবে প্ররোচিত করতে চেয়েছিল এবং ইবলিসের অনুসারী কাফের-মুনাফিকরা কীভাবে ইসলামের প্রজ্জ্বলিত রশ্মিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। সেই সাথে আরো জানা যায়, আল্লাহর অপরিসীম করুণায় কীভবে কোথায় হযরত আদম-হাওয়ার (আ) তওবা কবুল হলো, আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করতে গিয়ে হযরত ইব্রাহিম-ইসমাইল (আ) কী চরম আত্মোৎসর্গের মহা-দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, নিবেদিত-প্রাণ হযরত হাজেরার (আ) স্নেহবৎসল ব্যাকুল প্রার্থনার বিনিময়ে কীভাবে আল্লাহ আবে-জমজমের অফুরন্ত রহমত-ধারা প্রবাহিত করলেন এবং সর্বশেষে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মহানবী (স) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রা) কত সীমাহীন নির্যাতন ভোগ করলেন সে সবের জাজ্জ্বল্যমান ইতিহাস এখানকার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এ সবকিছু মুসলিম মিল্লাতের জন্য চিরদিনের জন্য এক অফুরন্ত অনুপ্রেরণার উৎস।

হজ্বের মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন যেমন পরিশুদ্ধ হয়, অন্যদিকে তেমনি সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সমমর্মিতা ও আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামকে এক বিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য আকাংক্ষা প্রমূর্ত হয়ে ওঠে।

## যাকাত

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হলো যাকাত। জীবন ধারণের জন্য অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ গুরুত্বের কারণে অর্থনীতি অনেক সময় জীবনের অন্যান্য সকল দিকের উপরে স্থান পেয়ে যায়। অর্থোপার্জন, অর্থের পুঁজি বৃদ্ধি এবং অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতার দিকে মানুষের সার্বিক দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ও অগ্রগতিকেই তখন মানুষ জীবনের প্রধান মকসুদ রূপে গণ্য করে। সন্দেহ নেই, ইসলামও অর্থনীতিকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আল্লাহ-ভীতিপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই সামাজিক সাম্য, শান্তি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে বলে ইসলাম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। মানব-সভ্যতার আদিকাল থেকে খোদাহীন অর্থ-ব্যবস্থা তথা কখনো পুঁজিবাদী রাক্ষস, আর কখনো সমাজতন্ত্রী খোক্ষস নির্মম শোষণের যাঁতাকলে সমাজ-দেহকে পিষ্ট করেছে। ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থা ঐ রাক্ষস-



www.pathagar.com

খোক্ষসের বিরুদ্ধে এক সবল-চ্যালেঞ্জ। একমাত্র ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক সাম্য, নিরাপত্তা ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত হতে পারে।

ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো নিম্নরূপঃ স্বাধীন পরিবেশে প্রতিটি কর্মক্ষম মানুষের হালাল তথা বৈধ উপায়ে উপার্জনের ব্যবস্থা, অর্থোপার্জনের সকল অবৈধ উপায়-উপকরণের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করা, যাকাত আদায় ও সুষ্ঠুরূপে তা বন্টনের ব্যবস্থা, সামগ্রিক সমাজ-কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং বেঁচে থাকার নিম্নতম সামগ্রী যথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা সুনিশ্চিতকরণ। কোরআন এবং হাদীস থেকে এ সবকিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। এখানে এ সবকিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করার অবকাশ নেই। শুধু যাকাত সম্পর্কেই এখানে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থার একটা প্রধান উপকরণ যেমন সুদ, ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তিও তেমনি অনেকটা যাকাতের উপর নির্ভরশীল। সুদ হলো শোষণের হাতিয়ার। অন্যদিকে যাকাত হলো সুষম বন্টনের গ্যারান্টি। ইসলাম তাই সুদকে করেছে হারাম বা নিষিদ্ধ। আর যাকাতকে করেছে হালাল ও বাধ্যতামূলক। বিত্তবানদের কাছে থেকে তাদের মালের একটা নির্দিষ্ট অংশ (শতকরা আড়াই ভাগ) নিয়মিত আদায় করে সমাজের বিত্তহীনদের মধ্যে তা সুষ্ঠুরূপে বন্টনের মাধ্যমে সুষম অর্থ-ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। যাকাত-ব্যবস্থা দাতার অনুকম্পা কিংবা গ্রহীতার দীনতার প্রতীক নয়। এটা হলো বিত্তবানদের ধনে বিত্তহীনদের ন্যায্য অধিকার। বিত্তবানদের নিকট থেকে বাধ্যতামূলকভাবে তা আদায়ের ব্যবস্থা করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে এ অর্থ এমনভাবে ব্যয় করা কর্তব্য যাতে পর্যায়ক্রমে সমাজের দারিদ্য দূর হয়ে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের শুরুতেই বলেছেনঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

"জালিকালকিতাবু লারাইবা ফিহি। হুদাল্লিল মুত্তাকিনাল্লাজিনা ইউমেনুনা বেল্‌গায়েবে। ওয়া ইউকেমুনাস্‌সালাতা ওয়া মেম্‌মা রাযাক্‌নাহুম্ ইয়োনফেকুন।" অর্থাৎ-এ কোরআন আল্লাহর কেতাব-এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। এটা পরহেজগার, আল্লাহভীরু লোকদেরকে দুনিয়ার জীবনের সঠিক ও সোজা পথ প্রদর্শন করে। পরহেযগার তারাই যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান এনেছে, নামায কায়েম করেছে এবং তাদেরকে যে রেযেক দিয়েছি তা থেকে তারা (আল্লাহর পথে) খরচ করে। (সুরা বাকারাঃ আয়াত ২-৩)।

এ একই সূরায় আর একটু অগ্রসর হয়ে আল্লাহ বলেনঃ উলাঈকা আলা হুদাম্মির রাব্বিহিম, ওয়া উলাঈকা হুমুল মুফ্‌লেহুন।-"এরাই রব-প্রদত্ত হেদায়াত লাভ করেছে এবং এরাই সফলকাম।" (সুরা বাকারাঃ৫)। অর্থাৎ যাদের ঈমান নেই এবং নামায ও যাকাত



www.pathagar.com

আদায় করে না, তারা শুধু আল্লাহর হেদায়াত থেকেই বঞ্চিত নয়, কল্যাণ ও সাফল্যও তাদের ভাগ্যে জুটবে না।

সূরা বাকরার ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ আবার বলেছেনঃ

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

"ওয়া আকিমুছছালাতা ওয়াতুজ্জাকাত"–"অর্থাৎ, "নামায কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর।" এভাবে কোরআন পাকের বহু স্থানে যাকাত আদায়ের তাগিদ দেয়া হয়েছে। নামায কায়েম করার নির্দেশ যেখানেই দেয়া হয়েছে ঠিক সেখানে সঙ্গে সঙ্গে যাকাত আদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, প্রকৃতপক্ষে নামাযের পরেই যাকাতের গুরুত্ব অথবা যাকাত যার উপরে ফরয সে তা আদায় না করে নামায পড়লে সে নামায পড়ার কোনই অর্থ নেই। কারণ দুটি হুকুমই আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে এবং একই সাথে। অতএব, এর একটি হুকুম পালন করে আরেকটি পালন না করলে সে হুকুম পুরাপুরি পালনই করা হলো না। আর যে হুকুম পুরাপুরি পালন করা হয়নি প্রকৃতপক্ষে তা পালন না করারই শামিল।

যাকাত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা কেবল আখেরী নবীর (স) উম্মত হিসাবে আমাদের উপরই ফরয করা হয়নি বরং পূর্ববর্তী নবীদের যমানায়ও ফরয করা হয়েছিল। মহাগ্রন্থ আল–কোরআন থেকে এখানে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করছিঃ

সূরা আম্বিয়ার ৭৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ
وَإِقَامَ الصَّلٰوةِ وَإِيتَاءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوا لَنَا عٰبِدِينَ ۝

অর্থাৎ "আমি তাদেরকে করেছিলাম নেতা, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত, তাদেরকে ওহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে, তারা আমারই ইবাদত করত।"

এর পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইব্রাহিম (আ), হযরত ইসহাক (আ) এবং হযরত ইয়াকুব (আ) এর নামোল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁদের সম্পর্কেই এ আয়াতস্থ কথাগুলি পেশ করে আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, তাঁরা আল্লাহর নবী ও মানুষের নেতা হিসাবে মানব জাতিকে আল্লাহর পথের নির্দেশ দিতেন এবং আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত ওহী অনুযায়ী মানুষকে সৎকর্ম করতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে বলতেন। আর এটাই ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইবাদত।

সূরা মরিয়ম–এর ৫৫ নং আয়াতে হযরত ইসমাঈল (আ) প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝



www.pathagar.com

অর্থাৎ "সে (ইসমাঈল আ) তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন।"

সূরা আরাফের ১৫৬ নং আয়াতে হযরত মূসা (আ) কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেনঃ

قَالَ عَذَابِيْ أُصِيْبُ بِهٖ مَنْ أَشَآءُ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ۔

অর্থাৎ "আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি, আর আমার দয়া–তাতো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত; সুতরাং আমি এটা তাদের জন্য নির্ধারণ করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নির্দেশে বিশ্বাস করে।" হযরত মূসা (আ) এর পরেও বনি ইসরাইলগণকে বার বার যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা বাকারার ৮৩ নং আয়াতে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط

অর্থাৎ "স্মরণ কর, যখন ইসরাঈল–সন্তানদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতা–পিতা, আত্মীয়–স্বজন, পিতৃহীন ও দারিদ্রের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দেবে।" মহানবী (স) এর পূর্ববর্তী নবী হযরত ঈসা (আ) এর প্রতিও নামায কায়েমের সাথে সাথে যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সূরা মরিয়মের ৩১নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেনঃ

وَجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔

অর্থাৎ "যেখানেই আমি (ঈসা আ) থাকি না কেন তিনি (আল্লাহ) আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায়করতে।"

অতএব, এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, যাকাত একটি অবশ্য পালনীয় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা শুধু আখেরী নবী (স)–এর উম্মতের জন্যই নয়, পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের



www.pathagar.com

উপরও ফরয করা হয়েছিল–সামাজিক ক্ষেত্রে সুষম অর্থ বন্টনের গ্যারান্টি হিসাবে, সমাজের দরিদ্র, নিঃস্ব মানুষের–ন্যায্য আর্থিক পাওনা আদায়ের উদ্দেশ্যে। আর সেই সাথে অর্থের প্রতি মানুষের যে জন্মগত লোভ ও আকর্ষণ, আল্লাহর হুকুমে মানুষ সে লোভ ও আকর্ষণ পরিত্যাগ করে অভাবী লোকদের জন্য স্বোপার্জিত অর্থ উদারভাবে বিলিয়ে দিতে পারে সেটারও একটা পরীক্ষা হয় এর দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে অতিরিক্ত অর্থ–লিপ্সা, স্বার্থ–বুদ্ধি এবং বস্তুতান্ত্রিকতা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে রাখে। নামাজ এবং যাকাতের ব্যবস্থা মানুষকে তার প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আশরাফুল মখলুকাতের গুণে গুণান্বিতকরে।

মালকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদত্ত হয়। সূরা তওবার ১০৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا -

"খুজ্‌মেন আম্‌ওয়ালিহিম ছাদাকাতান্ তুতাহ্‌হেরু হুম ওয়া তুজাক্কীহিম বিহা" – অর্থাৎ তাদের ধন–সম্পদ থেকে যাকাত উসুল করে তাদেরকে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন করে দাও।

সোনা–রূপা ও মালের যাকাত আদায় করা ফরয। যারা এ ব্যাপারে অবহেলা করে এবং ঠিকমত যাকাত আদায় করে না, সূরা তওবার ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি কঠিন হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেনঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

"ওয়াল্‌লাযিনা ইয়াক্‌নেযুনায্ যাহাবা ওয়া লফিদ্‌দাতা, ওয়ালা ইউন্‌ফেকু নাহা ফি ছাবিলিল্লাহে, ফাবাশ্‌শির হুম্ বি আযাবিন আলীম।" অর্থাৎ যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা থেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় মোটেই খরচ করে না, তাদেরকে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ্দাও।"

যাকাতের টাকা কোন্ কোন্ খাতে ব্যয় করতে হবে আল্লাহতায়ালা কোরান পাকে তাও সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেনঃ

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ -



www.pathagar.com

"ইন্নামাছ ছাদাকাতু লিল্ ফুকারাঈ ওয়াল মাসাকিন, ওয়াল আমেলিনা আলাইকা ওয়াল মুয়া আল্লাফাতি কুলুবুহুম ওয়া ফির্‌রিকাবী ওয়াল গারেমিনা ওয়া ফি সাবিলিল্লাহি ওয়া ইব্‌নিস সাবিল। ফারিদাতান মিনাল্লাহ।" অর্থাৎ যাকাত আল্লাহর নির্ধারিত ফরয। এটা দেয়া হবে ফকীর, মিসকীন এবং যাকাত উসুলকারী কর্মচারীদেরকে। ভিন্ন ধর্মের লোকদের মন জয় করা, ঋণী ব্যক্তিদের ঋণ শোধ করা, আল্লাহ-নির্ধারিত সর্বজনীন কাজে এবং নিঃস্ব পথিকদের সাহায্যার্থেও এ থেকে খরচ করা হবে। (সূরা তওবাঃ৬০)।

যেসব খাতে যাকাতের টাকা খরচ করা যাবে কোরআন শরীফ তা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে। এ খাতগুলো হলোঃ (এক) গরীব-অভাবী লোক (দুই) মিসক ( তিন) যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারী (চার) ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য নও-মুসলিম অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি (পাঁচ) গোলাম ও কয়েদীদের মুক্তি দান (ছয়) ঋণী ব্যক্তির ঋণ শোধ (সাত) আল্লাহর পথে অর্থাৎ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এবং (আট) মুসাফির। এ আটটি খাতের কোন্‌টিতে কখন কী অবস্থায় যাকাত দেয়া যাবে হাদীস শরীফে তা বিস্তারিত উল্লেখআছে।

ইসলামী অর্থনীতির মূলভিত্তি যাকাত, আর এর কাঠামোগত অনুশাসনিক বিধান হলো হালাল উপার্জন। প্রকৃতপক্ষে, কলেমায় বিশ্বাসী, নামায আদায়কারীর কোন ব্যক্তির পক্ষে অর্থোপার্জনের জন্য হারাম পন্থা অবলম্বন করার কথা চিন্তাই করা যেতে পারে না। ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার মূল দায়িত্বই হলো সমস্ত অসৎ, অনৈতিক, চরিত্র-বিধ্বংসী ইবলিসী কাজ ও প্রবণতার সকল ছিদ্র-পথ ইস্পাততুল্য দৃঢ়তার সাথে রুদ্ধ করা এবং সে সাথে সকল হালাল কাজ ও বৈধ অর্থোপার্জনের সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা।

এবারে চিন্তা করুন, অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জনের যদি কোন ব্যবস্থা না থাকে, সূদী-ব্যবস্থা নির্মূল করা হয়, মুনাফাখেরী, মওজুতদারী, ভেজাল-কারবারী ইত্যাদি শোষণের সকল রাস্তা সমূলে উৎখাত করে হালাল উপায়ে অর্জিত সম্পদের উপর বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে সমাজের সম্পদ কি কখনো মুষ্টিমেয় কতিপয় সুবিধাভোগী মানুষের হাতে কুক্ষিগত হতে পারে? কখনো নয়। আর এ খোদাভীতিপূর্ণ, নৈতিক চেতনা-সম্পন্ন, মানব-কল্যাণকামী, যাকাত-ভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থাই ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এ সুষম, সুবিচারপূর্ণ, মানবিক অর্থ-ব্যবস্থা কায়েম করা শুধু কাম্য নয়, অপরিহার্য-ইসলামের দৃষ্টিতে পাঁচটি মৌলিক ইবাদতের একটি।

তাই যাকাতকে যারা শুধু দান-খয়রাত হিসাবে একটি পুণ্যের কাজ মনে করে অনেকটা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অপরিকল্পিতভাবে আদায় করে থাকে, আবার অনেকে আদায় করার তেমন কোন গরজই অনুভব করে না, তারা ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত নয়। যাকাত ইসলামে একটি মৌলিক অর্থাৎ ফরয ইবাদত হিসাবে গণ্য। মানব সমাজে অর্থনৈতিক দিকের অপরিহার্য গুরুত্বের কারণেই সুষ্ঠু ও কল্যাণময় অর্থ-ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ইসলামে এটাকে ফরয ইবাদত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।



www.pathagar.com

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশা করি এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ইবাদতের ভিত্তিতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা সমগ্র বিশ্বে শান্তি, কল্যাণ ও সুষ্ঠু মানবিক ব্যবস্থাকে অবারিত ও সুনিশ্চিত করাই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে সফল করার জন্য আমাদের সামগ্রিক জীবন তথা সমাজ-কাঠামোকে সম্পূর্ণ ইসলামী অনুশাসন বা খোদায়ী আনুগত্যের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। উপরোক্ত পাঁচটি মূলনীতি তথা ফরয ইবাদত সেই কাংক্ষিত ভিত্তির উপর সুদৃঢ় স্তম্ভ স্বরূপ। ইমারতের স্থায়িত্বের জন্য স্তম্ভ অবশ্যই মজবুত হওয়া প্রয়োজন। ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভ যে অতিশয় সুদৃঢ় আশা করি সে ব্যাপারে কারো মনে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এ মূল স্তম্ভের কোন একটিকেও বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন সম্ভব নয়। এটা হলো মৌলিক বিশ্বাসের ন্যূনতম দিক। প্রকৃত মুসলমানের লক্ষ্য হলো মৌলিক বিশ্বাসের উপর দৃঢ়বদ্ধ থেকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে বাস্তবায়িত করার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো। এ সার্বিক প্রচেষ্টার নামই 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'-অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল দিয়ে প্রাণান্তকর সংগ্রাম। এটা হলো ইবাদতের চূড়ান্ত পর্যায়। নিজের নফস তথা অসৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সাথে সাথে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং পৃথিবীর সকল খোদা-বিরোধী কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সর্বত্র আল্লাহর বিধান তথা কোরান-সুন্নাহর আদর্শকে বাস্তবায়িত করাই মুমিন জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ কাজ করতে হলে নিজেকে সর্বক্ষণ প্রস্তুত রাখতে হবে। সব কাজে, চিন্তা ও প্রচেষ্টায় একমাত্র কোরআন ও সুন্নাহকে সকল নির্দেশ ও অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে গণ্য করে চলার নামই সার্বক্ষণিক ইবাদত। 'ওমা খালাক্তুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লেইয়াবুদুন' অর্থাৎ, "আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল মাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি"-কোরআন পাকের এ বক্তব্যের মূল তাৎপর্য এটাই।

পরিশেষে বলতে হয়, আধুনিক বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানে অত্যন্ত অগ্রসর। অর্থনৈতিক বা বস্তুতান্ত্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রেও পৃথিবীর অনেক দেশ বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু তা সত্তেও নিরবচ্ছিন্ন শান্তি আজ কোথাও নেই। এক-শ্রেণীর মানুষ গগণচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ করে সীমাহীন ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত রয়েছে, অন্যদিকে আরেক শ্রেণীর মানুষ জীবন ধারণের নিম্নতম উপকরণ খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবে মানবেতর জীবন যাপন করছে। আবার অন্যদিকে, ধনৈশ্বর্যের প্রাচুর্য এবং ভোগ-বিলাসের সরোবরে নিমজ্জিত থেকেও দেখা যায় অনেকের জীবনে শান্তির নিদারুণ অভাব। শান্তির জন্য অস্থির হয়ে শেষ পর্যন্ত আত্ম-হননের অস্বাভাবিক পথ বেছে নিতেও অনেকে কুণ্ঠাবোধ করে না। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা বিশ্বে-সর্বত্র আজ শান্তির জন্য নিদারুণ উৎকণ্ঠা। এ উৎকণ্ঠার



www.pathagar.com

হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র আমাদের স্রষ্টার দেয়া বিধান দ্বীন-ইসলাম। এ দ্বীন কেবল মুসলমানদের জন্য নয়। সমগ্র মানব জতির জন্য। এ সত্য আমরা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারি এবং তা কার্যকর করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে পারি, ততই মঙ্গল।

বহু ইজমের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ক্ষত-বিক্ষত পৃথিবী ও মানব জাতির ইতিহাস। পুঁজিবাদের ঘুণেধরা বস্তা-পচা মতবাদ অনেক আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে। কমিউনিজম এবং সমাজতন্ত্র দীর্ঘ সাত দশক কাল পর্যন্ত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আজ মৃত লাশের মত প্রত্যাখ্যাত। মুক্তি-প্রয়াসী মানুষের কাছে আজ ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। সে জন্য অবশ্যই উপযুক্ত প্রস্তুতির প্রয়োজন। পৃথিবীর সর্বত্র সে প্রস্তুতি কম-বেশী চলছে তাতেও সন্দেহ নেই। শুধু বাংলাদেশে নয়; প্রায় বায়ান্নটি মুসলিম রাষ্ট্রেই বর্তমানে ইসলামকে বিজয়ী মতাদর্শ হিসাবে, সামগ্রিক জীবন-ব্যবস্থা হিসাবে পৃথিবীতে আবার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন চলছে। বিভিন্ন অমুসলিম দেশেও এমনকি জাপান, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে কাজ চলছে। ধীরে হলেও-সেখানকার অমুসলিম সমাজ-পরিবেশে ইসলামের কল্যাণধর্মী প্রভাব ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে। অসংখ্য অমুসলমান ইসলামের ছায়াতলে এসে অমৃতের সন্ধান পেয়ে জীবনকে সার্থক জ্ঞান করছে। তাদের মতই অন্যরাও যাতে জাহেলিয়াতের অজ্ঞানান্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের চির-দীপ্ত, উজ্জ্বল আলোক-রশ্মিতে স্নাত হয়ে জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজে পায়, সে জন্য ইসলামের পতাকাবাহী জ্ঞান-দীপ্ত বিপ্লবী সৈনিকদের এগিয়ে আসতে হবে। 'সত্য সমাগত-মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী'-এ ধ্রুব সত্যই ইসলামের বিপ্লবী কাফেলাকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করেছে।

বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানরা আজ নানাভাবে নির্যাতিত। বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া মুসলিম দেশগুলোতে কোরআন-সুন্নাহর অনুশাসন নেই। মুসলমান নামধারী একশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল চক্র মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে। তাই মুসলমানরা তাদের নিজেদের দেশেই অবরুদ্ধ, বন্দী। অমুসলিম দেশগুলোতে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানরা তাদের নিজেদের দেশেই অবরুদ্ধ, বন্দী। অমুসলিম দেশগুলোতে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানরা নানাভাবে নিগৃহীত। এমনকি, 'মুক্ত-বিশ্ব' নামে কথিত আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোতেও মুসলমানরা নানাভাবে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। ফিলিস্তিনী মুসলমানরা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত। লেবাননের মুসলমানরা ইহুদী-মার্কিনী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে দীর্ঘ পনের বছর কাল গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। আফগানিস্তানের মুসলমানরা সমাজতন্ত্রের দেশী-বিদেশী প্রতিভূদের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত জিহাদ করে প্রায় দশলক্ষ মুসলমানের শাহাদতের বিনিময়ে দেশকে বিজাতীয় কবল মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। কাশ্মীরের মুসলমানেরা ভারতীয় হানাদারদের হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত ও নিগৃহীত হচ্ছে। বসনিয়া হারজেগোবিনার মুসলমানেরা সার্বীয়-ক্রোসীয় খ্রীষ্টানদের হাতে চরমভাবে অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হচ্ছে, ইউরোপের বুক থেকে তাদেরকে সমূলে উৎখাত করার দানবীয় প্রচেষ্টা চলছে। চীন, বর্মা, পূর্ব ইউরোপের মুসলমানরা সমাজতন্ত্রের জগদ্দল পাথরের তলায়

www.pathagar.com

নিস্পিষ্ট হচ্ছে। তথাকথিত পুঁজিবাদী–গণতান্ত্রিক বিশ্বেও মুসলমানরা নানাভাবে নির্যাতিত। এমনকি মুসলিম–বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলেও রাজতন্ত্র, একনায়কত্ব, পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যাঁতাকলে প্রকৃত মুসলমান ও ইসলামী আন্দোলন আজ নানাভাবে পর্যুদস্ত। মূলতঃ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আজ বিশ্বব্যাপী যে ষড়যন্ত্র ও দমনমূলক তৎপরতা চলছে ইসলাম–বিরোধী সকল অপশক্তি তথা পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, খ্রীষ্টান, ইহুদী, পৌত্তলিক ইত্যাদি সকলেই তাতে একজোট হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী এ তৎপরতায় এক ধরনের মুসলমানরাও হাত মিলিয়েছে। প্রকৃত মুসলমানদেরকে আজ মৌলবাদী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে সন্ত্রাসী রূপে চিহ্নিত করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টির সূক্ষ্ম তৎপরতা চলছে। প্রকৃত মুসলমান ও ইসলামকে সন্ত্রাসের সমার্থক রূপে চালিয়ে দেবার বিশ্বব্যাপী কূট–তৎপরতা প্রবল প্রচার মাধ্যমের বদৌলতে অবিরত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। মূলতঃ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এটা এক গভীর ষড়যন্ত্র। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য বিনষ্ট করা এবং ইসলামকে এক বিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে না দেয়াই এর আসল উদ্দেশ্য। তাই মুসলমানদেরকে এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই; এতে সন্দেহ–সংশয় সৃষ্টি করারও কোন অবকাশ নেই। আল্লাহর দেয়া মহাগ্রন্থ আল–কোরআনই হলো এর একমাত্র সুস্পষ্ট, সুচিহ্নিত ও সুদৃঢ় ভিত্তি। বিগত দেড় হাজার বছরের মধ্যেও এর একটি যতি চিহ্ন পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তিত হবার কোন সম্ভাবনাও নেই। কেননা এ গ্রন্থের মালিক, বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ এ মহা ঐশী গ্রন্থকে অবিকৃত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন। এর পরে আল কোরআনকে বাস্তব জীবনে কীভাবে প্রয়োগ ও অনুসরণ করতে হবে তার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন আল্লাহর মনোনীত রসুল, আখেরী নবী হযরত মুহম্মদ (স) এর জীবন ও কর্ম–পদ্ধিতির মাধ্যমে আল্লাহ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। মহানবী (সঃ)এর জীবনের প্রতিটি কথা, কাজ ও দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। তাঁর জীবন হলো আল–কোরআনের বাস্তব প্রতিফলন। অতএব, আল্লাহর দেয়া লিখিত কিতাব এবং আল্লাহর মনোনীত রসুল (স) এর সুন্নত যে জাতির মধ্যে অবিকৃতভাবে বিদ্যমান সে জাতির মৌলিক আকীদা–বিশ্বাসের মধ্যে সংশয়–বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া কেবল অপ্রত্যাশিতই নয়; চরম দুর্ভাগ্যজনকও বটে।

এ দুর্ভাগ্যের লাঞ্ছনাপূর্ণ দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আমাদেরকে সকল সন্দেহ–সংশয় ও ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল অতিক্রম করে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর দেয়া দুটি নিয়ামত–আল–কোরআন ও সুন্নতে রাসুলুল্লাহ (স)কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। কেবল এদুটি নিয়ামতই আমাদের জীবনের সকল অশান্তি ও দুর্গতি মোচন করে ইহকাল ও পরকালের জীবনে অনাবিল শান্তি, কল্যাণ ও পরমানন্দ নিয়ে আসতে পারে। মনে রাখতে হবে, কালের যাত্রাপথে মানব জাতি মাঝে–মধ্যে এক চরম যুগ–সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়। তখন এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে মানব জাতির ভাগ্য পরিবর্তিত হয়। সমগ্র বিশ্ব আজ তেমনি এক মহা সন্ধিক্ষণে সমুপস্থিত। এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের



www.pathagar.com

মাধ্যমে গোটা মানবজাতির ভাগ্য আজ পরিবর্তন করার দুর্লভ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সারা বিশ্ব আজ অশান্তির আগুনে জ্বলছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা গোটা মানব সমাজে আজ সর্বব্যাপী অশান্তি, অনাচার জুলুম-অত্যাচার আর মানবতাহীন চরম ইবলিসী দাপট চলছে। মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থ, লোভ, লালসা ও অহংকারের কাছে মানবতা আজ চরমভাবে লাঞ্ছিত। মানুষের তৈরী মতবাদ, আদর্শ ও বিধানের মৌলিক দুর্বলতা ও ব্যর্থতা মানব জাতির কাছে আজ সুস্পষ্ট। এগুলো মানুষের দুর্গতিকে আরো নানাভাবে বৃদ্ধি করে চলেছে। তাই মানুষের এ দুর্গতি মোচন করতে তাকে আল্লাহর বিধানের অনুগত করতে হবে।

কিন্তু এটি কোন সহজ কাজ নয়। যুগে যুগে, হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে আখেরী নবী (স) এমন কি তাঁর অনুসারীরা পর্যন্ত যাঁরাই এ কাজ করতে অগ্রসর হয়েছেন তাঁদেরকেই জগদ্দল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রচলিত সমাজ ও ভ্রান্ত পথের অনুসারীরা তাদেরকে নানাভাবে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। সে সংঘাতপূর্ণ মানবেতিহাসের সমুজ্জ্বল অধ্যায় সম্পর্কে আমরা অনেকেই অবহিত। অতএব, মানবজাতির ভাগ্য পরিবর্তনের সহজ কোন পথ নেই-বিকল্প, নতুন কোন পথেরও কল্পনা করা অবাস্তব। সেই একই পুরনো পথ-যেখানে-হক বাতিলের নিত্য সংঘাত, সত্য-মিথ্যার আপোষহীন দ্বন্দ্ব-যার অনিবার্য পরিণতি হলা 'মিথ্যার বিনাশ আর দীপ্ত সত্যের অবশ্যম্ভাবী বিজয়।' আমরা যতই শান্তিবাদী হইনা কেন, বাতিল কখনো সংঘর্ষ ছাড়া বিনা প্রতিবাদে হকের অস্তিত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। অতএব বাতিলের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী সংঘর্ষের মাধ্যমেই হকের বিজয়কে অনিবার্য করে তুলতে হবে। অন্যথায় বাতিলকে রাস্তা করে দিতে হবে, এছাড়া গত্যন্তর নেই। কেননা সত্য এবং মিথ্যা, আলো এবং অন্ধকার, পাপ এবং পুণ্য কখনো একত্র সহ-অবস্থান করতে পারে না। একের আগমনে অন্যকে অবশ্যই বিদায় নিতে হয়। এ সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে আল্লাহর পথের অনুসারীরা চিরকাল দৃঢ়ভাবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মিথ্যার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন এবং সেজন্য পরীক্ষা ও আত্মত্যাগের জন্য তারা প্রস্তুত থেকেছেন। তাই ঈমানের সর্বোচ্চ পরীক্ষা হিসাবে হিযরত, জিহাদ ও শাহাদত-এ তিনটি পর্যায়কেই চূড়ান্ত রূপে গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহর নবী-রসুলগণও ঈমানের এ তিনটি পর্যায় অতিক্রম করেই ইসলামকে দুনিয়ায় বাস্তবায়িত করেছেন। চিরকাল ঐ একই পুরনো পথেই ইসলামের বিজয়কে অনিবার্য করে তুলতে হবে। বিশ্বের শতাধিক কোটি মুসলমান এ ঈমানী প্রত্যয়ে দীপ্ত হয়ে উঠলে, আল্লাহর মেহেরবানীতে ইসলামের বিজয় যে সুনিশ্চিত তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

অশান্তির বিষবাষ্পে ঘেরা পৃথিবীর নির্যাতিত মানবতার মুক্তি সাধনে মুসলমানরা কি তাদের ঈমানী দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবে না? যুগান্তকারী ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাকে তারা সুনিশ্চিতভাবে আল্লাহর বিধানের অনুবর্তী করে তুলবে না? অথচ এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের দায়িত্ব একমাত্র মুসলমানদেরই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ - وَ

يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -



www.pathagar.com

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে এমন এক দল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। (সূরা আল্-ইমরান, আয়াত-১০৪)।

এরপর আল্লাহ বলেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ

অর্থাৎ "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহতে দৃঢ় ঈমান রাখ।" (সূরা আল-ইমরান, আয়াত-১১০)।

এরপর আল্লাহ আরো কঠোর নির্দেশের সুরে ঈমানদারদের উদ্দেশ্য করে বলছেন ঃ

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۝ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ـ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا ـ

অর্থাৎ "তোমাদের কি হলো যে, তোমরা জিহাদ করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর-নারী এবং শিশুদের জন্য? যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক। এ জনপদ- যার অধিবাসী জালিম, এখান থেকে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও; তোমার নিকট থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট থেকে কাউকে আমাদের সহায় কর। যারা মু'মিন তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা কাফির তারা তাগূতের পথে সংগ্রাম করে, সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল। (সূরা নিসা, আয়াত- ৭৬ ও ৭৭)।

অশান্তির বিষবাষ্পে ঘেরা, কুফরী মতবাদে ভারাক্রান্ত, দুর্দশাগ্রস্ত মানবজাতিকে মুক্তি ও কল্যাণের সোনালী দ্বার-প্রান্তে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশ্ব-স্রষ্টার নির্দেশ মুতাবিক প্রাণান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আল্লাহর নির্দেশ পালন ফরয ইবাদত হিসাবে গণ্য।



www.pathagar.com

নিজের তথা বিশ্ব-মানবের ইহ-পরকালীন মুক্তি, কল্যাণ ও শান্তির জন্য আল্লাহর এ নির্দেশ পালন আজ অপরিহার্য।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর আরো একটি নির্দেশ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তা হলোঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ -

অর্থাৎ "তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মত-পার্থক্য সৃষ্টি করেছে।" (সুরা আল-ইমরান, আয়াত-১০৫)

অতএব, আল্লাহর প্রতি অবিচল ঈমান রেখে শীশা-ঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আজ মুসলমানদেরকে প্রাণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে দুনিয়ার সমস্ত খোদা-বিরোধী মত, পথ, আদর্শ ও বিধান উৎখাত করে আল্লাহর যমীনে একমাত্র আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী করার জন্য। একমাত্র এ পথই বিশ্ব-মানবতার মুক্তি, কল্যাণ ও শান্তির নিশ্চিত গ্যারান্টি।

বিশ্বের মুক্তিকামী কোটি কোটি নির্যাতিত মানুষ মহামুক্তির এ আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তের প্রত্যাশায় অধীর প্রতীক্ষারত। "নাছরুম মিনাল্লাহে ও ফাতহুন কারীব"- সত্য সমাগত মিথ্যা সে তো বিলীন হওয়ার জন্যই।

---

www.pathagar.com

# ইবাদত

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান